মহানগরে দাবানল

মনোরঞ্জন হাজরা

পূরবী পাবলিশার্স
১৩নং, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ : চৌদ্দই আশ্বিন, 'তিপ্পান্ন।

প্রকাশক : লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা
পূরবী পাবলিশার্স
১৩নং শিবনারায়ণ দাস লেন
মুদ্রাকর : শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪নং সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

দাম : দেড় টাকা

বলবার কথা

'মহানগরে দাবানল' গল্পের কোন ভূমিকা লেখার প্রয়োজন হয় তো ছিল না কিন্তু আজ দেশের ঘরে-বাইরে যখন জঘন্য ষড়যন্ত্র চলেছে এতবড় একটা মহান দেশকে পথে বসাবার—তখন অন্ধের মত, উন্মাদের মত তার ফাঁদে পা দেয়ার নাম দেশপ্রেম নয়, বরং তা বর্ব্বরতা। সম্মিলিতভাবে সে বর্ব্বরতাকে ঠেকাবার শক্তি এই দাবানলের মাঝেও দেখা গিয়েছিল। এই বইয়ে তাদেরই কথা লিখিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক দাঙ্গা মানুষের মনকে ভয়ানক ভাবে আচ্ছন্ন করেছে। সেজন্যে সবাই প্রতিকারের পথ খুঁজছেন। শিল্পীর কাজ সে পথে আলো ধরা। তা' কতটুকু সার্থক হয়েছে, সে বিচার করবেন পাঠকেরা—কাজেই এখানে তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই এবং তা শোভনও নয়।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'পূরবী পাবলিশার্স' ও 'ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সকে'। পূরবী পাবলিশার্সের প্রতিষ্ঠাতা বন্ধুবর গিরীন চক্রবর্ত্তী ও ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রদা (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)—এঁদের একজনের প্রকাশনা ও আরেকজনের কাগজ সরবরাহ না পেলে, এ বই এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর আলো দেখতে পেত না। প্রসঙ্গক্রমে শৈলেন প্রেসের কর্ম্মী বন্ধুদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—বইটার শেষরক্ষা করেছেন তাঁরাই।

১৪ই আশ্বিন '৫৩ গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নোঙরহীন নৌকা

পলিমাটির ফসল

উদয়গড়

এই সভ্যতা

নবজীবনের পথে

দুষ্টক্ষত

অদ্ভুত (যন্ত্রস্থ)

ষোলই আগষ্ট থেকে বর্ব্বর দাঙ্গায়
যাঁরা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে
প্রাণ দিয়েছেন
সেই সব মহাপ্রাণ মানুষের প্রতি
শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে—

দাবানল দেখেছ—দাবানল? যে দাবানল জ্বলে ওঠে গহন অরণ্যের মাঝখানে, গাছে গাছে আর শাখায় শাখায় সংঘর্ষে—আর যার ফলে অরণ্যের শ্যাম-সবুজ বিশাল-বিস্তৃতি মহাসমারোহে পুড়ে ছাই হয়ে যায়? বুঝি তেমনি দাবানল জ্বলে উঠেছিল সেদিন আমাদের মহানগরে।

বড় নিশ্চিন্ত হয়েছিলে সেদিন সেই দাবানলের অগ্নিশিখা দেখে, না? সুস্থ ও অক্ষত মানুষ আমি আর কখনো তোমাদের সামনে উদয় হতে পারব না! শোনো, দুঃস্বপ্নের মত তোমাদের এই সৃষ্টি করা দাবানলের স্মৃতি আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে নি, বরং তারই লেলিহান শিখায় আমি দেখেছি তোমাদের শেষ হিসাব-নিকাশের দিন। আমি করব তারই তূর্য্যনিনাদ।

সংঘর্ষের অগ্নিকুণ্ডে তোমরা আহুতি দিয়েছ তোমাদের বর্ব্বর কামনাকে। ইন্ধন পেয়ে জ্বলে উঠেছে সে আগুন—গ্রাস করবার আকাঙ্ক্ষায় ছড়িয়ে পড়েছে তার শিখা সভ্যতা, সংস্কৃতি আর মানুষের আত্মাকে। কিন্তু আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আমার সংঘর্ষে আহুতি দেব আমার শিল্পী-মনের কামনা—দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে সে আগুন। লক্ লক্ ক'রে সাপের মত ফণা বিস্তার ক'রে তোমাদের গ্রাস করবে তার শিখা যুগ-যুগান্ত

ধ'রে, এমন কি বাদ দেবে না তোমাদের ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনাকে পর্য্যন্ত।

এই আহুতিই আজ আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহুতি এই মহানগরের দাবানলে।

* * * *

সতেরোই আগষ্ট।

ভুতুড়ে রাত্রি নেমে এসেছে সমগ্র মহানগরীতে। সারাদিন যেন প্রলয়ের ঝড় বয়ে গেছে। এবার হয়ত খানিকটা শান্ত হবে। ফিরে আসবে শান্তি। আঃ আসুক ফিরে সেই দুর্ল্লভ মুহূর্ত্ত। মাথার ওপরে প্রতিদিনকার মত তারায় ভরা আকাশ দেখা যায় আজো। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এদিককার মোড়টায় প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ একটা আলোও আর অক্ষত নেই। তাই অন্ধকার নেমেছে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে। তবু অন্ধকারের সেই আস্তরণ ভেদ ক'রে দূরে কয়েকটা আলো দেখা যায়—যেন শ্মশানের শমীবৃক্ষে এক ঝাঁক জোনাকি।

কখন একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে ভিজে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বৃষ্টির। শুধু কি বৃষ্টিরই গন্ধ? আরও অনেক কিছু—ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধেও চারিদিকটা ভরপুর।

সারাদিনকার লড়াইয়ে যথেচ্ছ হাতবোমা, বন্দুক ও পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছে উভয়পক্ষেই। অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র, ইট, সোডা-

ওয়াটারের বোতল, ছোরা, কৃপাণ, তরোয়াল—এসবের বালাই ছিল না বল্‌লেই হয়। পেট্রোল ডাম্প থেকে ইচ্ছেমত পেট্রোল লুঠ ক'রে যেখানে খুশি সেখানে আগুন লাগানো হয়েছে। বৃষ্টিতেও সে আগুন নেভে নি, খুন-খারাপীর মধ্যে দমকলও বোধ হয় আসতে সাহস করে নি। তা'ছাড়া তারা কত জায়গায়ই বা যাবে? তাই অনির্ব্বাণ চিতার মত আগুন শুধু জ্বল্‌ছেই। সে আগুনের ছোঁয়াচ লেগেছে আকাশের কোনো কোনো প্রান্তে। অন্ধকারের ওপারে রাঙা আকাশ, জল্লাদের বীভৎস মুখমণ্ডলের মত যেন বিকট হয়ে উঠেছিল।

এদিকে সেদিকে চীৎকার উঠ্‌ছিল, 'আল্লাহো আকবর,' 'জয়হিন্দ।' মুহুর্মুহুঃ এই দুই রণধ্বনির মধ্যেই শত শত লোক খুন-জখম হয়েছে সারাদিনে। শত শত শব পড়ে রয়েছে রাস্তায়। অন্ধকারেও টের পাওয়া যায়। তা'ছাড়া কুকুরগুলোর ছুটোছুটিও যেন কেমন বীভৎস অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাশেই একটা তেতালা বাড়ী। একেবারে ওপরতলার একটা ঘরে জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে পায়চারী করছে একটি যুবক। অন্ধকার ঘরে তার চোখ দুটো যেন জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে। বিকাল বেলাই সে জেনেছে এতবড় মহানগরীর বুকে বাস ক'রেও সে সমস্ত সভ্য-পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

উত্তরে-দক্ষিণে, পূবে-পশ্চিমে তার প্রলয় হচ্ছে। সারাদিন ধ'রে বাড়ীটার নীচের তলাগুলো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তার ভয় হয়েছে এই বুঝি বা খসে পড়ে ওপর তলাটা।

বাড়ীটার কোন বাসিন্দাই নেই। কেউ কেউ তাল বুঝে পালিয়েছে—পালিয়েছে, কি পথে মরেছে হয়ত। কেউ কেউ লেগে গেছে যুদ্ধে কোন পক্ষ নিয়ে। সবচেয়ে মনে পড়ে তার দুটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলের কথা। সামনের পথটায় পাঁটা কাটার মত কাতারে কাতারে মানুষ কাট্‌তে দেখে ছেলে দুটো পাগল হয়ে গেল। পাগল অবস্থায় একটা ছেলে তেতালা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে মরল। আরেকটা ছেলে কোথায় যে ছুটে পালালো তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই। কিন্তু এসব ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও যুবকটি কোন কিছু হঠকারিতা করে নি। স্থির বিশ্বাস নিয়ে সে শেষ পর্য্যন্ত দেখতে চেয়েছে, কি হয়। নিশ্চিত মরণের কথাও সে ভেবেছে। আর এভাবে থাকলে তাকে মরতেও হবে। টের পেলে হয়ত তার সহ-বাসিন্দাদেরই কেউ কেউ এসে তাকে মেরে দিয়ে যাবে কিম্বা এখানে এইভাবে থাকলে অনাহারে সে বাঁচতে পারবে না। কদিন যে এরকম চল্‌বে তা বলাও যায় না।

তবু সে পায়চারী করতে করতে ভাবে—প্রথম সুযোগেই তাকে এখান থেকে পালাতে হবে। মরবে সে নিশ্চিতই।

যেদিকেই সে যাবে সেদিকেই পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। তবু মরার মত সে মরবে। শত্রুনিধন ক'রেই সে মরবে।

ঠিক এমনিতরো যখন তার মনের অবস্থা সেই সময় সেই ভুতুড়ে বাড়ীটার মধ্যে খুট-খাট্ ক'রে কি যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল।

যুবক দরজায় কান পাত্‌ল। তবে কি শত্রুরা তার অবস্থিতি বুঝতে পেরেছে? কি করবে সে কিছুই ঠিক করতে পারল না। একবার দরজায় কান পাতে আবার পথের দিকে জানালার ধারে যায়। ঘরে একখানা ছুরী পর্য্যন্ত নেই যে, সে আত্মরক্ষা করবে। আছে, তার ঘরে আছে শুধু কটা কলম, কাগজ, বই আর পুরোনো একটা চেয়ার, পায়া ভাঙা একটা টেবিল। নিজেকে যেন সে হারিয়ে ফেল্‌ল।

একি কাপুরুষতা তার মধ্যে!

আওয়াজটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। যুবকের চোখের সামনে ভেসে উঠল: শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রে পালানোর কতকগুলো চিত্র। সেই 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রীডম' গ্রন্থে ড্যান ব্রীনের পলায়ন কাহিনী, চট্টগ্রামেব অমর সন্তান সূর্য্য সেনের মিলিটারী-ব্যূহ ভেদ ক'রে পালানো। আর তার নিজেরও জীবনে—এই তো সেদিন, সেই আত্মগোপন ক'রে থাকার দিনগুলি: হঠাৎ এক রাতে গ্রামকে গ্রাম বেড় দিয়েছে পুলিশ এবং তারই গণ্ডীর মধ্যে এক-একটা বাড়ীকে সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে ঘিরছে আর তাকে ধরবার জন্য খানাতল্লাসী চালাচ্ছে। যে

বাড়ীটায় সে ছিল সে বাড়ীটাও অবশেষে এমনি ক'রে ঘেরাও করা হল। পাঁচিলে উঠে ক্ষীণ-চাঁদের স্তিমিত আলোকে সে দেখ্‌ল, ঠিক পাঁচিলের নীচেই চিঁড়িতনের গোলামের মত সারি সারি সব বন্দুকধারী কনেষ্টবলরা দাঁড়িয়ে। লাফিয়ে পড়ল সে বে-পরোয়া হয়ে। তারপর দৌড়ুল এঁকেবেঁকে। সেদিন সেই সশস্ত্র বাহিনী পারে নি তাকে গ্রেপ্তার করতে। আর আজ ?···আজ সে এমনিভাবে শত্রুর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে ? না তা কখনই হতে পারে না।

চেয়ার ও টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। ভাবল দরজার সামনে সেগুলোকে খাড়া ক'রে দিয়েই সে লড়বে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, কেন, তারই বা কি প্রয়োজন ? সমস্ত বাড়ীটা তো ভূতের বাড়ীর মত খাঁ খাঁ করছে। চারিদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। শত্রুর হাতে যদি আলো না থাকে তবে সে তো বেরিয়ে পড়তে পারে ঘর থেকে। কিন্তু তারা যদি সংখ্যায় বেশি থাকে ? তা'হলে ? তা'হলে ঘর ছেড়ে যাওয়া বিপজ্জনক। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার নজীর খুঁজে খুঁজে সে ভাবতে লাগল—কি করা যায়।

মনে পড়ল ষ্টালিনগ্রাড আর লেলিনগ্রাড যুদ্ধে সোভিয়েটের অধিবাসীদের সংগ্রাম। কেমন ক'রে তারা ঘরে ঘরে সংগ্রাম করেছিল শত্রুর বিরুদ্ধে। হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে প্রথমে সে ঢুকতে দেবে শত্রুদের ঘরে। তারপরে দরজার পাশ থেকে সরে পড়বে সে। কিন্তু শত্রু যদি সংখ্যায় অনেক হয় তা'হলে এ কৌশল

অত্যন্ত ভুল কৌশল। শত্রু বেশি হলে আগেই সিঁড়ির মুখে গিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সোভিয়েট যুদ্ধে তো প্রশ্ন ছিল বাড়ীটাকে বাঁচাবার। এ ক্ষেত্রে তো সে প্রশ্ন নেই! বাড়ীটাকে সে নাই বা বাঁচালো। শত্রুরা সংখ্যায় বেশি হলে সে একা কতক্ষণ লড়তে পারবে? তার চেয়ে তার ঘরে তাদের ঢুকিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়াই ভালো। তাই করবারই সে স্থির করল। দরজাটা খুলে ফেল্‌ল সে।

আবার আওয়াজ হল, খুট্‌-খাট্‌-খুট্‌। মনে হল সিঁড়ি বেয়ে যেন কে আস্‌ছে। একটু আলোরও রেশ দেখা গেল।

চরম মুহূর্ত্ত সমাগত প্রায়। বুকখানা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ ক'রে উঠল যুবকের। দরজার একপাশে সে লেপ্‌টে দাঁড়ালো। বুঝি শেষ মুহূর্ত্ত সেটা। প্রথমেই পড়ল টর্চের আলো, তারপর পিস্তল-ধরা একটা হাত। দেহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভুত ক'রে সে লাফিয়ে পড়ল সেই হাতখানার ওপর। মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশের মধ্যে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে সে রুখে দাঁড়ালো অগন্তুকের দিকে।

যুবকটির মুখের ওপর টর্চ ফেলে আগন্তুক পকেট থেকে আরেকটা পিস্তল বের ক'রে বললে, আরো একটা আছে বন্ধু।

যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। আগন্তুক আবার বললে, তুই যেটা কেড়ে নিয়েছিস তাতে একটাও গুলী নেই—কিন্তু এটা একেবারে ঠাসা।

টর্চের আলো একটু উপর দিকে উঠে গিয়েছিল। তারই

দীপ্তিতে সে দেখতে পেল আগন্তুক তারই বন্ধু। উচ্ছ্বসিত ভাবে সে চীৎকার ক'রে উঠল ওসমান !

—হ্যাঁ বন্ধু।

—সত্যিই তুই আমার বন্ধু !

আবহাওয়াটা বড় বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—কে বন্ধু, কে শত্রু চেনা বড় শক্ত হয়ে উঠেছে না, ব'লে ওসমান অনুরাগ ভরে যুবকটিকে জড়িয়ে ধরল। দুই বন্ধুতে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় পরস্পর পরস্পরের কাঁধে মাথা দিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দুজনেই মুখ তুলে দাঁড়ালো। বেদনায় আনন্দে দুজনেই থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

ওসমান বল্‌লে, ঘরে তোর আলো নেই প্রবীর ?

আছে, ব'লে প্রবীর সুইচ টিপে দিল।

আলোকিত হয়ে উঠল ঘরখানা। ওসমানের সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ। প্রবীর চম্‌কে উঠ্‌ল। ওসমান তার মনোভাব বুঝ্‌তে পেরে ব'লে উঠল, আমি কিন্তু আহত হই নি—ও রক্তের দাগ যারা খুন হয়েছে তাদের। পথে আস্‌তে আস্‌তে অনেকগুলো লোককে রেডক্রসের গাড়ীতে তুলে দিয়েছি।

প্রবীর অবাক হয়ে বল্‌লে, কিন্তু তুই এলি কি ক'রে ?

জনতা লুঠতরাজ করতে ব্যস্ত, ওসমান বল্‌তে লাগল, ভিড়ে পড়লুম তাদের এক-একটা দলে। আমার মনে হল তুই এ-পাড়ায় আছিস্, এখানে আমাকে যেমন ক'রে হোক পৌঁছুতেই হবে। তাই ছলনার আশ্রয় নিতে আমার এতটুকু

বাধে নি। মুসলমান জনতার কাছে বললুম আমি মুসলমান, হিন্দু জনতার কাছে বললুম হিন্দু। হিন্দুরা আবার গোত্র জিজ্ঞাসা করে। সোজা ব'লে দিলুম কাশ্যপ। দু'দলই ছেড়ে দিলে।

প্রবীর ওসমানের এই সহজ সরল কথাগুলো অবাক হয়ে শুন্‌তে লাগল। তাকে বাঁচাবার জন্যে সব কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে সে এই বিপদের মাঝখান দিয়ে তার এখানে এসে উঠেছে। পথের উন্মত্ত জনতার সামনে নানারকম উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়েছে। বন্ধু-গর্ব্বে সে এক অননুভবনীয় আনন্দ অনুভব করল। সেই আনন্দের আবেগে সে নিজের হাতের আর ওসমানের হাতের পিস্তলটা দেখিয়ে বল্‌লে, এগুলো পেলি কোথায় ?

আরে সে এক মজার ব্যাপার। এক বেটা জাহাজী এবারকার যুদ্ধে গিয়েছিল, কতকগুলো আমেরিকান সোলজারকে সে লুকিয়ে চুরিয়ে মদ দিয়ে দিয়ে পিস্তল আর হাতবোমা যোগাড় ক'রত। ফেরবার সময় কোনরকম কৌশল ক'রে সেগুলো সে নিয়ে আসে দেশে, ব'লে সহসা কাপড়ের ভেতর থেকে একটা থলি বের ক'রে ওসমান গোটা আষ্টেক হাতবোমাও দেখালো। প্রবীর বিস্মিত হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টি ফেলে দেখতে লাগ্‌ল সেই জিনিষগুলো।

ওসমান আবার বল্‌তে লাগল, ব্যাটা জাহাজী অস্ত্রশস্ত্রগুলো সবাইকে ভাগ ক'রে দিচ্ছিলো শত্রু মারবার জন্যে। আমার

মুখচোখ দেখে লোকটা আমাকে একেবারে অত্যন্ত বন্ধু ভাব্‌ল। আমিও সেই সময় প্রায় একটা বক্তৃতার মত ক'রে বললুম, 'আমাদের দেখতে হবে শত্রুর আসল কেল্লা কোথায়—সেই কেল্লায় আমাদের আঘাত হানতে হবে।' ব্যস্‌ আর যায় কোথায়! ব্যাটা আমাকে দিচ্ছিলো ছুটো, আমি বল্‌লুম 'আমার দোস্তরাও রয়েছে যে—গোটা আষ্টেক হাতবোমা দাও আর পিস্তল অন্ততঃ পক্ষে গোটাছুয়েক।' লোকটা তাই তুলে দিলে আমার হাতে। আমি সুযোগ বুঝেই জনতার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

ওয়াণ্ডারফুল, প্রবীর চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

তর্জ্জনীটা মুখের কাছে তুলে ওসমান বল্‌লে, চুপ! এত জোরে চীৎকার করবার অর্থ বিপদকে ডেকে আনা।

তা ঠিক, নীচু গলায় প্রবীর বল্‌লে।

আলো জ্বালানোটাও অবিশ্যি বিপজ্জনক, ওসমান বল্‌লে, আবার যেন সেই বম্বিং-এর দিনগুলো ফিরে এসেছে। কিন্তু সে যাইহোক্‌ এখন কাজ রয়েছে—

প্রবীর জিজ্ঞাসুভাবে ওসমানের দিকে তাকালো।

ওসমান বল্‌তে লাগল, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে এখানে জীবন কোথাও নিরাপদ নয়। হয় হিন্দু-জনতার হাতে, নয় তো মুসলমান-জনতার হাতে আমাদের মরতেই হবে। বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন সকলের কাছ থেকেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। পথের কারোকে আর বিশ্বাস করতে পারব না।

কারো গায়ে যে হাত তুলব তাও আমাদের দ্বারা হবে না কিন্তু তারা আমাদের অবলীলাক্রমে মেরে দিয়ে চলে যাবে। কাজেই—

প্রবীর এবার তার পুরোনো দিনগুলিকে ফিরে পেল যেন। সেও তাই আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, কাজেই মরতে যখন আমাদের হবে তখন মরার মত মরব। শত্রুনিধন ক'রে তবে আমরা মরব।

কিন্তু শত্রু কে ভাই, ওসমান বল্‌তে লাগল, কোন শত্রুকে আমরা নিধন করব? হিন্দুকে না মুসলমানকে? না, যারা মেতে উঠেছে এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে? কারা আমাদের শত্রু? তারা—না তাদের পিছনে আছে যারা চক্রান্ত ক'রে, তারা?

একটু আগে এই প্রশ্নই প্রবীরের মনে উঠেছিল। সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না কি করতে হবে। শত্রু কে আপাতঃ দৃষ্টিতে তা বুঝতে পারলেও তাকে সুমুখে পাবার তো কোন জো নেই। কাজেই নিষ্ফল আক্রোশে শুধু মনটা রি-রি ক'রে উঠ্‌ছিল। এখনও সেই একই চেতনা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ল। কি করবে সে? মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পায় না সে কিন্তু করণীয় কাজটা তার কি? এইসব ভাবতে ভাবতে ওসমানের প্রশ্নের উত্তরে সে বল্‌লে, সবই বুঝলাম ভাই কিন্তু কি করা যায় বল্‌দিকি?

ওসমান আবার বল্‌লে, মরতে আমাদের হবেই। তাই

ব'লে যারা দাঙ্গা করছে তাদের আমরা কি মারব? না, তা নয়। কেন না ভাল লোকও আজ সাম্প্রদায়িকতার সামগ্রিক আবহাওয়ায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। বরং আমরা—

হয়েছে, হয়েছে! যেন একটা বিস্মৃত কথা প্রবীরের মনে পড়ে যায় এমনভাবে সে বল্‌লে, হ্যাঁ একটা কাজ আমরা পারি। পথে আস্‌তে আস্‌তে তুই অনেকগুলো লোককে রেড-ক্রসের গাড়ীতে তুলে দিয়েছিস, না?

—হ্যাঁ।

—আমরা সেই কাজই তো করতে পারি এখন পথে বেরিয়ে।

ওসমান বল্‌লে, আমি ব্যাপারটা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে করার কথা বল্‌ছি।

প্রবীর জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকালো। ওসমান বল্‌লে, আমরা সংগ্রাম করি আয় মৃত্যুর বিরুদ্ধে। এই প্রলয়ে হিন্দু আর মুসলমান, যারা দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করি আয়।

সেই ভাল, প্রবীর বে-পরোয়াভাবে বল্‌লে, মরতে যখন হবে তখন মানুষ বাঁচিয়েই যাই।

কিন্তু কাজ আছে, ওসমান বল্‌লে, কাগজ বের করদিকি কিছু।

—কি হবে?

—বের কর না।

প্রবীর কিছু সাদা কাগজ বের ক'রে আন্‌ল। কাগজগুলো আনতেই ওসমান সেগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলে বল্‌লে, লেখ্ 'হিন্দুর দোকান'—আর আমি লিখি 'মুসলমানের দোকান।' আর ছাখ লেইটেই করবার কিছু সরঞ্জাম আছে ?

—কেন ?

—দেখব যে পটিতে যারা আক্রমণ করতে পারে বা করছে সেই পটিতে সব দোকানগুলোয় অমনি তাদের সম্প্রদায়ের দোকান ব'লে এই শ্লিপগুলো এঁটে দোব।

ঠিক হ্যায়, উৎসাহ সহকারে প্রবীর একটা গ্লয়ের শিশি এনে ওসমানের সামনে বসিয়ে দিল।

বাইরে তখন ঘড় ঘর ক'রে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। ঘরের মধ্যে তু'জনেই কান খাড়া ক'রে উঠ্‌ল। শব্দটা যেন ক্রমশঃ নিকটতর হয়ে আস্‌ছে। এদিককার অঞ্চলটা সমস্ত নিস্তব্ধ। দূর থেকে ভেসে আসছে 'আল্লাহো আকবর' আর 'জয়হিন্দের' কোলাহল। মাঝে মাঝে এদিক সেদিকে বিউগল্ ও হুইসিল বাজছে। মড়কের পল্লীগ্রামে যেমন মঙ্গলধ্বনি করা হয় শঙ্খ বাজিয়ে, তেমনি কোথায় কোন দূর হিন্দু মহল্লায় ক্রম-বিস্তৃত শঙ্খধ্বনি করছে কারা সঙ্কেত জানিয়ে।

ঘড় ঘড় ক'রে এগিয়ে আসা আওয়াজটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হঠাৎই চীৎকার উঠল যেন, 'আল্লাহো আকবর।'

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মানুষের অন্তরে অন্তরে ভীতির সঞ্চার ক'রে সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে দিক-দিগন্তে। একটানা কোলাহল করতে করতে ছুটে আসছে যেন একটা উন্মত্ত জনতা: সঙ্গে সঙ্গে আরেকদিক হতে শোনা গেল ঠিক তেমনিতরো ভাবেই 'জয়হিন্দ'। দুটো আওয়াজ মহা-নগরের দু'দিককার আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে যেন।

বেশ বোঝা গেল দুটো বাহিনী আসছে দুদিক থেকে। এবার তারা সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হবে।

ওসমান খাড়া হয়ে ব'লে উঠল, এই প্রলয়ের মাঝখানে নেতারা আজ কেউ পথে নেই।

বাস্তবিক, প্রবীর অভিভূতের মত বললে।

সেদিনও সেই তেরশো পঞ্চাশের দিনে, ওসমান ঘরের মেঝেয় পায়চারী করতে করতে ব'লে উঠল, এই সোহরাবর্দ্দীই বাংলা মায়ের পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছেলেমেয়েকে না খেতে দিয়ে মেরেছিল! সেদিনও এদেশের নিয়মতান্ত্রিক নেতারা আজকের মত অবস্থাতেই ছিলেন। তাঁরা সেদিন মৃত্যুসংখ্যার তালিকা তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন। কোন রিলিফের ব্যবস্থা করার চাইতে মৃত্যুসংখ্যা যত বাড়বে ততই লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন নিকটতর হবে, এই স্বপ্নই দেখেছিলেন। আর আজও ঠিক সেই কথাই ভাবছেন, ভ্রাতৃমেধ যজ্ঞ যত তীব্র হবে ততই সোহরাবর্দ্দীর পতনের পক্ষে জনমত তৈরী হবে। সেদিন সেই পঞ্চাশের

মন্বন্তরে যেমন দেশের মানুষকে বাঁচাবার দায়িত্বও তাঁরা বোধ করেন নি, আজও তেমনি তাঁরা তা বোধ করছেন না। তা যদি বোধ করতেন তা'হলে ছুটে আসতেন পথে। উন্মত্ত জনতাকে ভ্রাতৃহত্যার অন্ধ-আবেগ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন।

প্রবীরের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল একবার। ঠোঁটেও কি যেন এক দৃঢ়-সঙ্কল্প। কিন্তু পরক্ষণেই একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে, তাদের যদি কেউ মেরে দেয়—অতো বড় বড় সব অমূল্য জীবন!

এই অমূল্য জীবনের অমূল্য রূপ মানুষ দেখতে পেত, ওসমান তেমনি ভাবেই পায়চারী করতে করতে বলতে লাগল, যদি একজন নেতাও হাজার হাজার মানুষকে রক্ষা কববার জন্যে এগিয়ে এসে প্রাণ দিতেন। মুসলিম লীগের নেতারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে নিরীহ, শান্ত মুসলমানকে ক্ষেপিয়ে নিজেরা আড়ালে থেকে ছেড়ে দিয়েছে তাদের পথে পথে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা হিন্দুর ধনপ্রাণ ধ্বংস ক'রে বেড়াচ্ছে। আর অন্যদিকে তাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নেতারা মন্ত্রিত্ব বদলের স্বপ্নে মসগুল হ'য়ে ঘরে কবাট এঁটে বসে আছেন। ইতিমধ্যে দেশবাসীর মহান ঐতিহ্য ধুলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে স্বার্থপরায়ণ নেতৃত্বের হাতে। আমাদের নেতারা ভুলে গেছেন লালা লাজপতের কাহিনী, দিল্লীর জুম্মা মসজিদে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার

অমর ইতিহাস, কাণপুর-দাঙ্গায় শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গকারী প্রভাবশালী কংগ্রেসনেতা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর কথা।

প্রবীর বলে উঠল, দেউলিয়া হয়ে গেছে, এদেশের নেতারা।

শুধু দেউলিয়া নয়, ওসমান তেমনিভাবেই বলতে লাগল, আরো অনেক কিছু। জনসাধারণকে এঁরা দেখতেই পান না। খুব বেশি যদি করেন, যাবেন লাটসাহেবের কাছে, লর্ড ওয়াভেলের কাছে। কর্ত্তব্য সেইখানেই শেষ। তারপর কিছু দিন চলবে বিবৃতি, চার্চিলের মত মধ্যযুগীয় সালঙ্কার ভাষায়। তাতে সমস্যা বেড়েই চলবে, সমাধান আর হবে না।

প্রবীর অভিশাপ দেবার মত ক'রে ব'লে উঠল, দিস্ ক্রিমিন্যাল লীডারশিপ্ মাষ্ট্ গো—

আবার সেই ঘড় ঘড় ক'রে আওয়াজ। আওয়াজটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ বাঁশচেরা শব্দের মত একটানা যেন কি একটা শব্দ হয় কিছুক্ষণ ধ'রে। প্রবীর আর ওসমান দু'জনেই জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঘরের আলোটা নিবিয়ে দেবার জন্যে ওসমান ইসারা করল প্রবীরকে। প্রবীর সুইচটা অফ্ করে দিলে।

তারপর জানালার খড়খড়ি ফাঁক ক'রে দুই বন্ধুতে পথের দিকে দেখতে লাগল। বেগুনী রঙের আলোয় সমস্ত পথটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সারি সারি ট্যাঙ্ক ছুটে আসছে ঘড় ঘড় ক'রে। ট্যাঙ্কের খুপ্রি থেকে চালানো হচ্ছে মেসিনগান আর টমিগান।

কোলাহল যেন ঝিমিয়ে আসে। উন্মত্ত জনতা দু'দিকে সরে যায়। মেসিনগান আর টমিগানের গুলী ফুল্‌কি কাটে শুধু্ রাতের বুকে।

এরই এক ফাঁকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল দুই বন্ধুতে।

*

রাত তখন কত বোঝা যায় না।

আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। মেঘও দু'একখানা ভেসে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মহানগরীর রাজপথ শবাকীর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষের রক্তস্রোত বৃষ্টিধারায় মিশে গিয়ে সারা পথটাকে গ্রামের পথের মত পিচ্ছিল ক'রে তুলেছে। পায়ে যে জুতো আছে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করা যায় না। পথের দু'পাশে বাড়ীঘরগুলো নিস্তব্ধ। মনে হয় জনমানবহীন। দু-একটা উঁচু বাড়ীর ছাদে নর-নারীর চাপা কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পচা শবের গন্ধ বহন ক'রে বাতাস বহে যাচ্ছে একদিক হতে আরেক দিকে। কোথাও কোথাও রাতের আকাশকে মুখর ক'রে গর্জ্জে উঠছে রাইফেল। ইষ্টকও বর্ষিত হচ্ছে কোন কোন জায়গায়।

প্রবীর অভিভূতের মত ব'লে উঠল এমনি ক'রে মানুষ ক্ষেপে উঠল কেন বলদিকি ?

ক্ষেপে যে কেন উঠল তা তো সবাই জানে ভাই, ওসমান বলতে লাগল, জেনেশুনে যে মানুষ এমনিতরো হয়ে উঠল কি ক'রে আমি শুধু সেইটাই ভাবি।

—এ নিশ্চয়ই ক্যাবিনেট মিশনের কারসাজি।

হ্যাঁ এতো তাদের ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসির জন্যেই হয়েছে।

—একবার ক্ষেপিয়েছে কংগ্রেসকে লীগের বিরুদ্ধে আরেকবার ক্ষেপিয়েছে লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

হুঁ, ওসমান সামনের দিকে একটা বিরাট ধূম্রাবরণ দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর চাপা কণ্ঠে বললে, কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে। আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে। মনে হচ্ছে যেন ওদিকটায় আগুন লাগিয়েছে, ছোটখাটো লড়াইও চলছে বোধ হয়। না দেখে আমাদের আর এগুনো সমীচীন হবে না।

—গুলী কিম্বা টিয়ার গ্যাসও হতে পারে তো?

—টিয়ার গ্যাসের দিন আর নেই। ও নিশ্চয়ই অন্য কিছু।

—মিলিটারী ফায়ার ক'রছেনা তো?

—তা'হলে শব্দ হ'ত। তা'ছাড়া—

—তা'ছাড়া কি?

গুণ্ডার দল আগুন লাগাতেও পারে, ওসমান চিন্তিতভাবে বললে, যাকগে আমরা এখানটায় খানিকটা গা ঢাকা দিয়ে থাকি আয়—

ওসমানের বেকুবি দেখে প্রবীর হেসে উঠে বললে, আচ্ছা পাগল তো তুই ওসমান।

ওসমান খপ্ ক'রে প্রবীরের হাত ধ'রে ব'লে উঠল, এই খবরদার—নাম নয়।

ভুল হয়ে গেছে, প্রবীর লজ্জিত হয়ে বললে।

ওসমান বললে, এমনিতরো একটা ভুলে তোর আমার কিম্বা আমাদের দুজনেরই জীবন চলে যেতে পারে। হিন্দু জনতা হলে তারা আমাকে তো মারবেই। আমাকে আগলাবার জন্যে তোকেও মারবে। আর মুসলমান জনতাও তাই করবে—আগে তোকে মারবে তারপর আমাকে। কাজেই······যাক্ কি বলছিলি বল?

বলছিলাম এতো ফাঁকা পথ, প্রবীর বললে, এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকব কোথায়?

মনে নেই, প্রবীরকে একটা ঠেলা দিয়ে ওসমান বললে, এরি মধ্যে ভুলে গেছিস সেদিনের কথা?

প্রবীর অন্ধকারের মাঝেই ওসমানের দিকে তাকিয়ে রইল। ওসমান ব'লে চলল, রসিদ আলী দিবসের কথা মনে নেই? সেই সন্ধ্যের অন্ধকারে ডাষ্টবিন গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার পিছনে পিছনে আমরা হামাগুড়ি দিতে দিতে যাচ্ছিলুম। সোলজারগুলো টেরও পেলে না।

হ্যাঁ, প্রবীর সমর্থনের স্বরে বললে।

ওসমান বললে, এই তো সামনে কটা ডাষ্টবিন রয়েছে—আয় না এইখানে আমরা গুঁড়ি মেরে বসে থাকি।

—বেশ।

ডাষ্টবিনগুলোর কাছে যেতেই একটা পচা গন্ধে যেন নাড়ী উঠে এল তাদের।

ডাষ্টবিনের ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখে ছুটো লোককে গলাকাটা অবস্থায় ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। লাসগুলো সম্ভবতঃ গতরাত্রির, তাই এরি মধ্যে পচে এমনি গন্ধ উঠেছে।

প্রবীব বললে, এখানে টঁ্যাকা তো দায়।

ওসমান বল্‌লে, অনেকক্ষণ দম বন্ধ ক'রে মাঝে মাঝে এক একবার নিঃশ্বেস টাননা তা হ'লেই ঠিক থাকা যাবে।

উপায় নেই। অগত্যা তাই-ই করতে হল।

নিঃস্তব্ধ পথকে মুখরিত ক'রে কয়েকটা রেডক্রসের গাড়ী ছুটে গেল। প্রবীর বল্‌লে, সম্ভবতঃ ওখানে একটা লড়াই হয়ে গেছে। তাই রেডক্রস ছুট্‌ছে আহতদের নিয়ে।

ওসমান বল্‌লে, আমারও মনে হয়।

দূরাগত একটা কোলাহলের শব্দ শোনা গেল। মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদও ছু-একটা ভেসে এল যেন। প্রবীর আকাশের দিকে তাকালো। নক্ষত্র-খচিত রাত্রির কালো আকাশ। লঘু মেঘ ছু'একটা, আব্‌ছা ভাবে কখনও কখনও নক্ষত্রগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে। বাতাসে যৎপরোনাস্তি ছড়িয়ে পড়ছে পচা শবের গন্ধ। পৃথিবীর অন্যতম মহানগরীর বুকে নেমে এসেছে মহাশ্মশানের ছায়া—না হিন্দুস্থান, না পাকিস্তান, শুধু গোলামী-স্তানের হাহাকার। নাক টিপে অভিভূতভাবে প্রবীর বল্‌তে লাগ্‌ল, একটিমাত্র কারণ এই অবস্থার পিছনে—

শুধু বৃটিশ শাসন, অস্ফুটস্বরে ওসমান বল্‌লে।

আরও কয়েকটা রেডক্রসের গাড়ী হুহু শব্দে ছুটে চলে

গেল। দু-একটা প্রাইভেট কারও রেডক্রসের লেবেল এঁটে তীরবেগে কোথায় যেন ছুট্‌ল।

দূর থেকে আর্ত্তনাদের শব্দও বেশ ভেসে আস্‌ছে।

ওসমান বল্‌লে, দ্যাখ্‌ ওদিকে লড়াইটা বড় রাস্তায় হচ্ছে না—নিশ্চয়ই গলি-ঘুঁজির, মধ্যে হচ্ছে। প্রথমটায় আমরা খুব জোরে বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে যাই চল। তারপর ঠিক জায়গাটা আন্দাজ ক'রে পাশের কোন গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তার পিছন দিকে গিয়ে উঠ্‌ব। আর তারপর আমাদের কাজ।

পচা শবের গন্ধ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যেন তারা বাঁচল। ঝড়ের বেগে তারা সংঘর্ষস্থলের দিকে ছুট্‌তে লাগল। খানিকটা আস্‌তেই বড় রাস্তা থেকে একটা বড়গোছের রাস্তা পশ্চিম দিকে বেরিয়ে গেছে। তার মোড়ে কয়েকটা দোকানের ভিতর ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আগুন জ্বল্‌ছে। আর একদল পুলিশ ও মিলিটারী যথেচ্ছ ভাবে দোকানের এদিক-সেদ্দিক থেকে মালপত্র সরিয়ে গলির ভেতর রাখা সারি সারি তাদের ট্রাকগুলোর মধ্যে তুল্‌ছে।

—প্রবীর চেয়ে দ্যাখ্‌।

—বেড়ে আছে সব।

—ওদেরই পোয়া বারো।

—যা বলিছিস্‌।

এমন সময় তাদের দেখ্‌তে পেয়ে দুটো মিলিটারী ডাক্‌ করলে। রাইফেলে টোটা ভরার আওয়াজ পেয়েই প্রবীরকে

টান্ দিয়ে ওস্মান বল্‌লে, ব্যাটারা তাক্ করছে—ছোট্ যত জোরে পারিস্ ছোট্।

দুম্ দুম ক'রে পিছনে দুটো আওয়াজ হল। পাশের একটা দোকানের লাইট-কেসের কাঁচগুলো ঝন্ ঝন্ করে খসে পড়ল। ওসমান বল্‌লে, তাক্ ফস্কেছে ব্যাটাদের। কিন্তু আর নয় আমরা সেই সংঘর্ষ স্থলটার কাছে প্রায় এসে পড়িছি। সামনের এই গলিটায় ঢুকে পড়ি আয়। লং-রেঞ্জের রাইফেলে তাক্ করলে মারা পড়ব এ রাস্তায়।

পশ্চিম দিককার একটা গলিতে তারা ঢুকে পড়ল। গলিটায় ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়ালো। তারপর ঠিক ক'রে নিলে এই গলি দিয়ে কেমন ক'রে সংঘর্ষ স্থলের দিকে যাবে এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কোথায় এসে মিলিত হবে। তারপর বাড়ীগুলোর দেয়ালে কান পাততে লাগল তারা শব্দ চিরকালই বাধার পোষ মানা। প্রাচীর গাত্রে এসে সে ধরা দেয়।

ওসমান বল্‌লে, টের পেলি ?

প্রবীর বল্‌লে, তুই ?

—না।

—প্রাণভয়ে সব পালিয়েছে তা হলে বাড়ী খালি ক'রে।

—তাই হবে।

আরও একটু এগুলো তারা। আবার একটা বাড়ীর দেয়ালে কান পাতলো। এমনি ক'রে ক'রে তারা গলিটার

একেবারে সীমান্তে এসে হাজির হল। দেয়ালে কান পেতে তারা দেখেছে গলিতে কোন বাড়ীতেই প্রায় লোক নেই। কাজেই হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ হবার কোন সম্ভাবনাও নেই।

গলিটা পার হয়েই আরেকটা রাস্তা। সেই রাস্তাটার খানিকটা এসেই আরেকটা গলির মুখ। দাঙ্গা হচ্ছে এই গলিরই ভেতরে। মাঝে মাঝে আওয়াজ উঠ্‌ছে 'আল্লাহো আকবর।' সে আওয়াজ থেমে যাচ্ছে আবার আওয়াজ উঠ্‌ছে, 'জয়হিন্দ।'

—ইয়ো খোদা!

—ভগবান।

আর্ত্তনাদ ভেসে আস্‌ছে। মনে হচ্ছে এখানে একেবারে হাতাহাতি লড়াই চলেছে। সংখ্যায় দুপক্ষই নিশ্চয় খুব অল্প! তা না হলে আরও গোলমাল হোতো। গলির দুইমুখে দুই বন্ধুতে দাঁড়ালো।

দু'একটা লোক ছুট্‌তে ছুট্‌তে গলির মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের দেখতে পায় নি। লোকগুলোকে ভাল চেনা গেল না।

প্রবীর বল্‌লে, মহল্লাটা দেখে মনে হচ্ছে হিন্দু মহল্লা।

ওসমান বল্‌লে, কাজেই এখানে মুসলমানরা আক্রমণ করেছে বুঝ্‌তে হবে।

—সম্ভবতঃ।

—কিন্তু আর দেরী নয়। এর আশে পাশে সবই প্রায় মুসলমান বস্তি। এখনও যেকজন হিন্দু আছে—সবাই এসে পড়লে এদের একজনেরও চিহ্ন থাক্‌বে না। এদের যেমন ক'রেই হোক্ বাঁচাতে হবে।

দ্রুতবেগে তারা গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল। খানিকটা যেতেই শুনতে পেল বিরাট এক জনতা 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে বড় রাস্তা দিয়ে যেন এদিকেই আস্‌ছে। খটাখট্ ক'রে শব্দ হতে লাগল। সম্ভবতঃ বাড়ীগুলোর দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দেয়া হচ্ছে।

প্রমাদ গণল ওসমান, প্রমাদ গণল প্রবীর। এই হিন্দু পল্লীটা অন্যান্য হিন্দুপল্লী থেকে সম্ভবতঃ বিচ্ছিন্ন হয়েই আছে। কেননা এখানে মুসলিম জনতা তাড়াতাড়ি রি-ইন্‌ফোর্স করতে পারল; হিন্দুরা তো তা পারল না। নিশ্চয়ই যোগাযোগের সমস্ত পথও রুদ্ধ। এবং এই পকেটের মধ্যে তারাও পড়ে গেছে। চোখের সামনে তাদের এই মহল্লাটা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তারপর যাবে তারাও—এ কখনও হ'তে পারে না। মানুষকে বাঁচাবার ব্রত নিয়ে তারা পথে বেরিয়েছে। তারা জানে যে তাদের মরতেই হবে। কিন্তু মরতে হবে ব'লে নিরুপায় অসহায়ের মত তারা মরবে না। ভুলবেও না এই দাবানলের মাঝখানে তাদের পবিত্র ব্রতের কথা, কর্ত্তব্যের কথা।

ওসমান বল্‌লে, আমরা যেদিক থেকে এলুম জনতাটা সেইদিক থেকেই আস্‌ছে।

—হ্যাঁ তো !

—অথচ আমরা আসবার সময় মিলিটারী আমাদের তাক্ করেছিল। কারফিউ অর্ডারের কোনো মানে হয়? এই যে জনতা আস্‌ছে নিরপরাধ নরনারী, শিশু হত্যা করতে, একে কি তাদের রোখা উচিত ছিল না?

—তারা এখন লুটের মাল নিয়ে হয়তো ব্যস্ত।

—তাই, কিন্তু আমাদের আব দেরী করলে চল্‌বে না। যেমন ক'রেই হোক্ এই পল্লীটাকে আমাদেব বাঁচাতে হবে।

পাশের একটা বাড়ীতে দরজা খোলা ছিল—ঝড়ের মত তারা ঢুকে পড়ল। দরজার পাশেই ছোবা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল একটি যুবক। তেড়ে এল সে প্রাণভয়ে। ওসমান পিস্তল বাগিয়ে ধ'রে বল্‌লে, আপনার চেয়ে আমার অস্ত্র আরও মারাত্মক। কিন্তু আপনি আমাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করুন। আমরা তাড়িয়ে দোব দুষমণদের কিন্তু আমাদের নিরাপত্তার জন্যে আপনি দরজা খুলে রাখ্‌বেন।

কথাগুলো বলেই আবার তেমনি ক'রেই ওসমান ও প্রবীর বেরিয়ে পড়ল। তারপর গলির যেদিক থেকে তারা এসেছিল সেইদিকে গেল ওসমান। জনতার সঙ্গে মিশে গিয়েই ওমমান ব'লে উঠ্‌ল, আরে ভাই বড় রাস্তার ওপাশে বড় জোর দাঙ্গা হচ্ছে—মুসলমান ভাইদের ঘিরে ধরেছে একদল লোক। তোমরা এসো আমার সঙ্গে—আগে তাদের বাঁচাই। আ যাও ভাই—আ যাও।

—তুম্ দেখা !

জরুর। হাম হুঁয়াসে আতা হ্যায়। দেরী করো মাৎ। জেরাসে দেরী হোগা তো সব খতম হো জায়গা, যেন আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠে সমস্ত জনতাকে ঠেলে ঠুলে নিয়ে সে ছুটল বড় রাস্তার যেদিক দিয়ে তারা এসেছিল তার বিপরীত দিকে।

এদিকেও খবর পেয়ে আসছিল একটা বিরাট হিন্দু জনতা। গলির মুখে এসেই হেঁকে উঠ্‌ল, 'জয় হিন্দ।' আকাশ বাতাস মুখরিত ক'রে সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল দশ দিকে। প্রবীর জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, শত্রুদের আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।

সাবাস, বলে উঠ্‌ল একটা লোক। তাদের হাতের আলোতে দেখা গেল লোকটা প্রবীরের পরিচিত লোক। লোকটার নাম কালু। বিখ্যাত গুণ্ডা লোকটা। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বস্ত্র-ইয়ার্ডে লোকটা প্রবীরের ফাল্‌তু ছিল। লম্বাই চওড়াই চেহারা তাব। মাথায় গান্ধীটুপি। কালু গুণ্ডাও আজ 'জয়হিন্দ' উচ্চাচরণ ক'রে দেশপ্রেমিকের মর্য্যাদা পেয়েছে।

লোকগুলো ফিরে যাবার সময় প্রবীর একটা ঠোক্কর দিয়ে বল্‌লে, কালু ভাল আছ তো?

—কে ?

—আমি প্রবীর। নয়া জেলখানার সেই বস্ত্র-ইয়ার্ড মনে পড়ে ?

ও—বাবুজী, কালু এগিয়ে এসে হাত ধরল প্রবীরের। তারপর বল্‌লে, বাবুজী ভাল আছেন ?

হ্যাঁ। লোকটাকে কত সিগারেট খাইয়েছে প্রবীর। জেলখানায় বিড়ি সিগারেট রাজ-ঐশ্বর্য্যের চেয়েও বেশি কিছু তো, কম নয়। আজ কৃতজ্ঞতায় সম্ভবতঃ কালু কারা-জীবনের সেই দুঃখময় দিনগুলির কথা স্মরণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। তারপর দলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, ইধার বাবুজী আছেন—কুনো ভয় নাই। সব চলো—

তারা ফিরে যেতেই প্রবীর গলিটার ভেতর দিকে গেল। যে বাড়ীটায় সেই ছোরা-হাতে ছেলেটি ছিল, সেই বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। প্রবীর বিস্মিত হল দুঃসাহসী ছেলেটির কথা ভেবে। এই দরজাটা তারা খুলে রাখবার কথা বলেছিল। কিন্তু তা রাখেনি এরা। প্রবীর ঘৃণাভরে বারকয়েক দরজাটায় ধাক্কা দিলে।

কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলে সামনে বেরিয়ে এল সেই ছেলেটি। প্রবীর বল্‌লে, খুব তো লোক মশাই আপনারা। দরজাটা খুলে রাখ্‌তে বলেছিলাম না আমরা ?

কি করি মশাই, ছেলেটি বল্‌লে, বাড়ীতে সবাই বল্‌লে। তা' আপনি আসবেন আমাদের বাড়ীতে ?

না, বলে চুপ ক'রে রইল প্রবীর।

—আপনার সে সঙ্গীটি কোথায় গেলেন ?

—মুসলমান জনতাটাকে তাড়িয়ে দিতে গেছেন।

—একলা !

—হ্যাঁ।

—খুব সাহস তো ! ভদ্রলোক আমাদের বাঙালী ?

বাঙালী অর্থে 'হিন্দু' বুঝতে হবে। লোকগুলোর চেতনা দেখলে রাগ ধরে। প্রবীর মজা দেখবার উদ্দেশ্যে সবকিছু না বলে শুধু বল্‌লে, না।

—তবে কি মোচরমান ?

—ধরে নিন্‌না তাই—

—আপনার সঙ্গে মোচরমান !

—তাতে হয়েছেটা কি।

ছেলেটি এবার অত্যধিক উৎসাহে বলে উঠ্‌ল, না মশাই ওদের বিশ্বাস নেই। আপনি বরং আমাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ুন। সে এসে আপনাকে দেখতে না পেয়ে চলে যাবেখন।

—কিন্তু এর পরে যদি আক্রমণ হয় তখন কি করবেন ?

—আমরাই রুখব।

—কি ক'রে, বাড়ীতে খিল্ দিয়ে !

প্রবীরের খোঁচাটা ছেলেটি বেশ বুঝ্‌তে পারল। তাই খোঁচাটাকে সরাসরি সে শোধ না দিতে পেরে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের মত আসল কথা এড়িয়ে গিয়ে বলে উঠ্‌ল, আপনি কি কমিউনিষ্ট ?

কেন, প্রবীর খিঁচিয়ে উঠে বল্‌লে, তা হ'লে এইখানেই একহাত নেবেন নাকি ?

ছেলেটি বল্‌লে, কমিউনিষ্ট না হ'লে মুসলমানের সঙ্গে—

বন্ধুত্ব হয় কেমন ক'রে না, প্রবীর বল্‌লে. মরণের মুখে দাঁড়িয়েও আপনারা বিদ্বেষ কখনো ভুল্‌তে পারেন না। ঐ বন্ধুটি আমার না থাক্‌লে এতক্ষণ এইভাবে কথা বলবার সামর্থ্যও আপনার থাক্‌ত না।

ও মুসলমান আর কমিউনিষ্ট, ছেলেটি বল্‌তে লাগল, ছাখো আর কচুকাটা করো।

প্রবীর আশ্চর্য্য হয়ে গেল ছেলেটির কথা শুনে। তারপর ভাবল—না দোষ নেই তার! রক্তে এরা বিদ্বেষ নিয়ে জন্মেছে, অফিসের বড় সাহেব কাকে কতটা নেকনজরে দেখ্‌লেন তারই হিসাব-নিকাশে এদের পূর্ব্বপুরুষ সময়ক্ষেপ করেছেন আর হিংসায় হিংসায় জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছেন। অফিস আর বাড়ী— বড়সাহেব আর বউ, এক দ্বীপ হতে আরেক দ্বীপ, এরি মধ্যে এদের যাতায়াত আর তাই নিয়েই এদের হুনিয়া। কালচারের সঙ্গে সংস্পর্শ নেই। ছেলেরা এদের নোট মুখস্ত করে এম-এ পাশ করার মরুভূমিতে প্রাণের ধারা হারিয়ে ফেলেছে। অক্ষমতা আর ব্যর্থতার গ্লানিভরা জীবনক্ষেত্রে, বিদ্বেষের বীজ যত সহজে অঙ্কুরিত হতে পেরেছে তত সহজে আর কিছু নয়। এদের নেতারাও সেই আবহাওয়া থেকেই মানুষ। এদের কালচারও তাই। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে করতে আর নিজেদের জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে করতে এরা একচোখো, অমানুষ বর্ব্বর তৈরী হয়ে উঠেছে। মরণের মুখে

দাঁড়িয়েও বিদ্বেষকেই বাঁচার পুঁজি মনে করে; বুড়ো বাপের শামুকের খোল পোরা কলসীকে টাকার থলি ভেবে একভাই আরেকভাইকে চোখ ঠারে। প্রবীর বেশ কড়া ভাবেই বল্লে, তবু তো কমিউনিষ্ট ঠেঙান নি একদিনও—আর মুসলমানও হত্যা করেন নি একটাও!

সুবিধে পায়নি তাই, ছেলেটি বল্লে।

আজ তো পেয়েছিলেন, প্রবীর বল্লে, অন্ততঃ মুসলমান-দের। কমিউনিষ্ট না হয় না পেয়েছিলেন।

ছেলেটি নির্লজ্জের মত ব'লে উঠ্ল, আপনি তা হলে কি কমিউনিষ্ট নন?

—না।

—ঠিক বল্ছেন?

এই প্রশ্নে প্রবীরের আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্ল। কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে এরা কোন খবরই রাখেনা। কর্পোরেশনে আর মন্ত্রিমণ্ডলীর দপ্তরে বসে বেনামীতে কণ্ট্রাক্ট মারা লীডারদের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ গিলে এরা এমনি ধারণা ক'রে রেখে দিয়েছে যে সুস্থভাবে কিছু ভাবতেও পারে না। সে নিজে কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শও নেই। তবু তার কেমন ভাল লাগে ঐ কমিউনিষ্ট পার্টিটাকে। প্রত্যেকটি কমিউনিষ্টের জীবনে যেমন অপূর্ব্ব কর্ম্মনিষ্ঠা, তেমনি অপূর্ব্ব আদর্শনিষ্ঠা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতা, সমস্ত

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র, অনেক উকিল, ব্যারিষ্টার, মিলমালিক জমিদার, ফেমিন-মেকার, চোরাকারবারী, মিলিটারীতে মেয়ে সাপ্লায়ার, গুণ্ডা, দাগীচোর একসঙ্গে এক লাইনে দাঁড়িয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল কিন্তু কই পারল না তো কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করতে। আদর্শে অটুট আস্থা রেখে কমিউনিষ্টরা অচল অটলভাবে সবকিছুকে রুখল। কতখানি আদর্শনিষ্ঠা আর কর্ম্মনিষ্ঠা থাক্‌লে একটা দল এতবড় ঝড়ের বিরুদ্ধে খাড়া থাক্‌তে পারে তা ভাবতেও যেন কেমন লাগে। শুধু এই একটা ব্যাপারেই প্রবীরের কমিউনিষ্ট পার্টিকে যার পর নাই ভাল লাগে।

কিন্তু কথা তো নয়। প্রবীর জানে কমিউনিষ্ট পার্টি ব'লে কোন কথা নয়। যে কোন লোক সৎ কথা, যুক্তির কথা, আজকের দিনে বল্‌বে, তাকেই কনিউনিষ্ট ব'লে আখ্যা দেয়া হবে এবং গোড়া থেকেই তাকে যাতে অবিশ্বাস করবার স্পৃহা জাগে, তারই জন্যে মনকে প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে—এই হচ্ছে আজকের ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মর্ম্মবাণী। কাজেই সে কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্ট নয়—তাতে কিছু আসে যায় না। উত্তর যাই দিক না সে, তার শ্রোতা তার গোত্র বুঝে নেবেই।

তাই সে কোন কিছু জবাব দেবার আগেই চিন্তিতভাবে কি যেন খানিকটা ভাবল। এ হচ্ছে ভারতের জাতীয়তাবাদের সেই ভবিষ্যৎ বংশধর, কোন শালীনতা, শোভনতা জ্ঞান নেই—

সোজাসুজি হয়ত লোক জড়ো ক'রে ব'লে দেবে মুসলমানদের সঙ্গে কমিউনিষ্টরাও হিন্দুদের ঠেঙাচ্ছিল। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীও জুটে যাবে। পরদিন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের নিকৃষ্ট-চরিত্র মালিকদের প্ররোচনায় সেইসব বিবরণগুলি সযত্নে পরিবেশন করা হবে। সে নিজে কমিউনিষ্ট পার্টির লোক নয়—কেন সে নিজের জিদের খাতিরে অতোবড় একটা আদর্শবান পার্টির এতবড় একটা সর্ব্বনাশ করবে। এমনিই তার মনে হয়, নেতারা কেউ রাস্তায় বেরোন নি—হয়ত ঘরে বসে সেই অস্ত্রই শানাচ্ছেন। এরপর কোন কিছু ঘটলে তাঁদেরই সুবিধা ক'রে দেয়া হবে।

তাই প্রবীর রাগত ভাবে জবাব না দিয়ে বল্‌লে, কমিউনিষ্ট পার্টি আমাদের মত লোককে পার্টিতে নেয় না।

এবার ছেলেটি যেন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। সে বল্‌লে, ওদের ওপর আমার আর কিছু রাগ নেই— ওরা ছেলে মেয়েতে বিয়ে করে।

এবার প্রবীর হেসে বল্‌লে, বিয়েটা কি ছেলেয় ছেলেয় হয়—না তা ক'রলে খুসি হন ?

না তা নয়, ছেলেটি এবার মনের কথা বলে উঠ্‌ল, থাক্‌গে ওসব কথা। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় ?

—কিসের ?

—আর আক্রমণ-টাক্রমণ হতে পারে নাকি ?

পিছন হতে ওসমান এসে ব'লে উঠ্‌ল, নিশ্চয়ই। চারিদিকে

মুসলমান পল্লী, আর এইটুকু একটা হিন্দুপল্লী তার মাঝে কখনো অক্ষত থাকে ?

—তা হ'লে ?

—তা হ'লের ব্যবস্থা করবারই জন্যই তো আমরা আছি। এখান থেকে আপনাদের সব সরে পড়তে হবে। কোনো নিরাপদ জায়গায় যেতে চান তো এখুনি সব বেরিয়ে আসুন।

ওপর থেকে প্রশ্ন এল। সম্ভবতঃ ছেলেটির মা প্রশ্ন ক'রলেন, আমরা যেখানে নিয়ে যেতে বল্‌ব সেখানেই নিয়ে যাবে তো ?

ওসমান বল্‌লে, এখন তো চলে আসুন। তারপর আবার সেখান থেকে যেতে চান তো তার ব্যবস্থা সেখানে হবে। দেরী করবেন না সব বেরিয়ে আসুন।

প্রবীর জিগ্যেস ক'রলে, রেডক্রসের কোনো গাড়ীটাড়ী পাওয়া গেছে নাকি ?

হ্যাঁ, ওসমান বল্‌লে, কমিউনিষ্ট পার্টির একটা রেস্কিউ কার যাচ্ছিলো সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি গলির মুখে ?

ছেলেটি ব'লে উঠ্‌ল, কমিউনিষ্ট পার্টির রেস্কিউ কার ?

—হ্যাঁ। কমিউনিষ্ট পার্টি, কিছু কিছু ভাল লোক আর কয়েকটা সেবা-সমিতি ছাড়া তো আর কেউ রেস্কিউ করতে বেরোয় নি। অবিশ্যি রেডক্রস একাই যা করছে তাই একশো। নেতাদের খুব উচিত ছিল রেস্কিউ অর্গানাইজ করা। এমনিভাবে মানুষের প্রাণহানি হত না।

ছেলেটি বল্‌লে, কেন নেতারা তো গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করেছেন। রেডিওতে বল্‌লে।

—তা করেছেন অবিশ্যি।

ইতিমধ্যে তিনচারটে বাড়ী থেকে কয়েক দল নরনারী গলিতে এসে হাজির হল। ওসমান বল্‌লে, আমি এগিয়ে যাই—প্রবীর তুই পিছনে আয় আর ওঁরা সব থাকুন মাঝখানে। তারপর সবাইকে যেন এক রকম হুকুম ক'রেই সে ব'লে উঠ্‌ল, চলুন।

গলির মুখে লরীতে তুলে দিয়ে ওসমান একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, দিস্ ইজ্ আওয়ার ফার্ষ্ট ভিক্টরী।

অ্যাণ্ড উই উইল্ বি অলওয়েস ভিক্টোরিয়াস্, প্রবীর বল্‌লে।

—অতঃপর এগিয়ে চলো বন্ধু।

তারপর হিংসায় উন্মত্ত মহানগরীর বুকে পথ বেয়ে চল্‌ল দুই বন্ধুতে। তারা পরস্পরের বুকে ছোরা বসাতে পারতো কিন্তু সভ্যতার পথ হতে তারা বর্ব্বর যুগে ফিরে যায়নি।

রাত্রির অন্ধকার অভিশাপের মত যেন ঝরে পড়ছিল পৃথিবীর বুকে।

পরদিন প্রভাত হল। সিঁদুরের মত চারিদিক রক্তিম। পিছনে দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে কতকগুলো দোকানপাট আর বাড়ী। আশপাশে সব পাল্লাভাঙা দোকান আর গুদাম। দোকানগুলোয় লুঠ হয়েছে। যেন সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে, একটি পিন পর্য্যন্তও পড়ে নেই। রাজপথে যতদূর তাকানো যায় ততদূর শুধু রাশি রাশি শব। শবগুলোর গায়ে ব্যর্থজীবন মানুষের বিকৃত কামনার অসংখ্য চিহ্ন। দেখলে শিউরে উঠ্‌তে হয়।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যুদ্ধদিনের স্পিট্‌ফায়ারের মত আকাশে অসংখ্য শকুন—শবাকীর্ণ এলাকার মাথায় চক্কোর দিয়ে ফিরছে।

প্রাণভয়ে সাধারণ মানুষ কেউ পথে বেরোয় নি। খাঁ খাঁ করছে পথ। মেঘলা আকাশের স্বাভাবিক নিয়মে গুমোট বাতাস বইছে। পচা শবের গন্ধে আর দগ্ধ বাড়ীঘরের ধোঁয়ায় নাসারন্ধ্র যেন বুজে আসে। আবর্জ্জনার স্তূপে পথচলা দায়।

ষোলই আগষ্ট থেকে মহানগরীর স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। ট্রাম-বাস বন্ধ, রিক্সা-ঠেলা, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীও পথে বেরোয় নি। সমস্ত রেশন শপ বন্ধ, গোয়ালায় দুধ দেয়নি,

ফেরিওয়ালা জিনিসপত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে যায়নি, তরী-তরকারীর বাজার বসেনি, হোটেল রেস্তোরাঁ, ময়রার দোকান কোনো-কিছুই আর খোলা হয় না। এমনি অবস্থায় নাগরিক জীবনে যে শ্মশান ও কবরের ছায়া নেমে এসেছিল, সেকথা না বল্‌লেও চল্‌বে।

অনাহার সুরু হয়ে গেছে ঘরে ঘরে। শিশুরা কুঁক্‌ড়ে আস্‌ছে যেন। মৃত্যুর ভয়ে ঘরের মধ্যেই মলমূত্র ত্যাগ, সেখানেই যা হয় কিছু খেয়ে সেখানেই থাকা—এমনিভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষের জীবন। বড় বড় লোকেদের যেমন তেমন হোক্, দরিদ্র বাড়ীগুলোতে ইতিমধ্যেই মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়েছে। অভিশাপ দিচ্ছে তারা বিধর্ম্মীদের অভিশাপ দিচ্ছে তারা এই মহানগরে দাবানল জ্বেলেছে যারা, তাদের।

হিন্দুমহল্লার একটা বস্তির মধ্যে এসে উঠেছিল ওসমান আর প্রবীর। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলে কিছুদূর পরেই একটা কর্দ্দমাক্ত বস্তি পড়ে। বস্তিটাতে আস্‌তেই চোখে পড়ল গতরাত্রির ভয়াবহ এক লড়াইয়ের চিহ্ন। আশেপাশে অসংখ্য শব। বৃদ্ধ যুবা নারী শিশু কেউই বাদ যায় নি। বস্তিটা হিন্দু বস্তি। মানুষের পৈশাচিক বর্ব্বরতার নমুনা রয়েছে প্রতিটি শবে।

একদিকে একটা বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ল। সম্ভবতঃ একটি যুবতী মেয়েকে হত্যা করবার আগে ধর্ষণ করা হচ্ছিল।

মেয়েটি প্রাণভয়ে শেষবারের মত শত্রুকে আঘাত হানবার জন্য সেই ধর্ষণকারীর টুঁটিটা কামড়ে ধরেছিল। লোকটাও মুক্তি পাবার জন্য তার বুকে সেই অবস্থায় বসিয়ে দিয়েছিল ছোরা। দুটো লাস যেন একেবারে গাঁথাগাঁথি হয়ে পড়ে আছে।

চম্‌কে উঠল ওসমান, চমকে উঠ্‌ল প্রবীর। লাস দুটো দেখে তারা শুধু পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করল। বস্তিটায় অবশিষ্ট বল্‌তে বোধ হয় আর একজনও ছিল না। তারা চলে আসছিল। তবু আসবার আগে কয়েকটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। একটা ঘরে ঢুকতেই দেখে জানোয়ারের মত হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের এককোণে সরে গেল কয়েকটা মেয়ে আর পুরুষ।

ওসমান বল্‌লে, বেরিয়ে এসো।

অসহায়ভাবে লোকগুলো কাঁদতে লাগল। প্রবীর বল্‌লে, কোন ভয় নেই—আমরা তোমাদের মারতে আসিনি।

লোকগুলো যেন আশ্বাস পেল ব'লে বোধ হল। কিন্তু কিছুতেই তারা এগিয়ে আস্‌তে পারল না।

ওসমান আর প্রবীর কিন্তু কেউই একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকতে পারল না। মলমূত্র ত্যাগ করা হয়েছে সেই ঘরে—তার দুর্গন্ধে ঘরখানা যেন সাক্ষাৎ নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। ওসমান বল্‌লে, প্রবীর তুই ছাখ ভাই—আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি, কোথাও কোন গাড়ীটাড়ী পাই কি না!

প্রবীর অতঃপর ঘরের মধ্যে গেল। লোকগুলোকে টেনে

টেনে বাইরে আনল। জীবনের স্পন্দন যেন তাদের আর নেই।

টেনে টেনে এনে তাদের ঘরের দাওয়ায় বসালো। জানোয়ারের মত দৃষ্টি মেলে তারা দেখতে লাগল বাইরেকার মৃতদেহগুলি।

ওসমান কিছুক্ষণ পরে ফিরল একটা রেডক্রসের গাড়ী নিয়ে। লোকগুলোকে তাইতে তুলে দিয়ে আবার তারা বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে হিন্দুমহল্লায় আক্রমণের মহড়া চলেছে।

পাড়ার একটি যুবক। নাম নরেশ। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। প্রাণপণে সে লড়াই চালাচ্ছে এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বিরুদ্ধে। পুরোনো কংগ্রেস-কর্ম্মীহিসেবে তার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। পাঁচ ছশো লোক সমবেত হয়েছে তারই বাড়ীর সুমুখে। তারা চায় নরেশ তাদের আক্রমণে নেতৃত্ব গ্রহণ করুক। কিন্তু নরেশ বল্‌লে, আত্মরক্ষা আর আক্রমণ ঠিক এক জিনিষ নয়। কংগ্রেস-কর্ম্মীহিসেবে আমি বল্‌ব আমরা আত্মরক্ষাই ক'রে যাব—আক্রমণ নয়।

জনতার মধ্যে থেকে ব'লে উঠ্‌ল, তা বল্‌বেন বৈকি। আমরা শুধু আত্মরক্ষা করি আর তারা আমাদের মেরে ধুনে দিয়ে যাক্‌।

নরেশ বুঝ্‌তে পারল জনতার গতি ও মনোভাব।

চোখের সামনে তার ভেসে উঠ্‌ল, গত দুদিনকার মানুষের চেহারা। মুসলিম লীগ হিন্দু জনসাধারণকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার প্রেরণায় প্রতি হিন্দু পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠ্‌ল আত্মরক্ষামূলক দল। আগষ্ট আন্দোলনের সেই অভিজ্ঞতা, যুদ্ধের দিনকার জনরক্ষা কমিটির আন্দোলন, সেই ধর্ম্মতলা হত্যাকাণ্ডের দিনে পাড়ায় পাড়ায় নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা, রসিদ আলী দিবসে প্রতি মহল্লায় প্রতিরোধ—এমনিতরো শত শত সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় জনসাধারণের মনে যে সাংগঠনিক ধারণা জন্মেছিল সেই ধারণা নিয়ে সর্ব্বত্র গড়ে উঠ্‌ল এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মরক্ষা বাহিনী।

এই সব বাহিনীগুলোর মধ্যে কিছু কিছু লোক ছিল যারা ডিমবিলাইজ্‌ড্‌ সামরিক কর্ম্মচারী, এ-আর-পি, সিভিল-ডিফেন্স প্রভৃতির লোক। এককালে এদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এরা আত্মরক্ষা বাহিনীগুলিকে জঙ্গী কায়দায় রূপান্তরিত ক'রে ফেলল।

লাল আলো, নীল আলো, বিউগল, হুইসিল, দিনের বেলায় ছাদ থেকে নিশান দিয়ে সিগ্‌ন্যালিং, ফার্ষ্ট এড ষ্টেশন প্রভৃতি চোখের নিমেষে গড়ে তুল্‌ল। কিন্তু তখনও ব্যাপারটা আত্মরক্ষার গণ্ডীর মধ্যেই রইল।

কিন্তু যত সময় চলে যেতে লাগল ততই এরা উদ্বেলিত,

চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। তার উপর প্ররোচনার অন্ত নেই চারিদিকে।

তবু নরেশ এই বাহিনীগুলিকে কিছুতেই আক্রমণাত্মক বাহিনীতে পরিণত হতে দেয়নি। মুহূর্ত্তে তাহ'লে প্রলয় হয়ে যাবে সারা মহানগরীতে। বার বার সে ফোন করেছে বি-পি-সি-সি অফিসে আর নেতাদের বাড়ীতে। কয়েকবার কনেকশনই পায়নি, দু-একবার যাও পেয়েছে, নেতারা বলেছেন আত্মরক্ষা তো করতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে, কিভাবে এবং কি রকম অবস্থায় তা কিছু তারা বলেন নি।

ষোলই আগষ্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষ্যে লীগ যেমন ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস ও হিন্দু মুসলমানের শত্রু, ঠিক তেমনি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও তাদের প্রচার-পত্র প্রভৃতিতে ঘোষণা করেছিল, মুসলমানরা হিন্দুর শত্রু। মুসলিম লীগের লোকেরাও যেমন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূর্ব্বাহ্ন থেকেই প্রস্তুত ছিল হিন্দু জনসাধারণকে আঘাত করবার জন্য, হিন্দু সম্প্রদায়িকতাবাদীরাও তেমনি সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি তৈরী ক'রে রেখেছিল পূর্ব্বাহ্ন থেকেই।

তারা এই আত্মরক্ষা বাহিনীগুলিকে প্রকাশ্যে উস্কানি দেওয়া সুরু করল।

উস্কানি দেবার উপকরণের অভাব ছিল না এমনিতরো মহানগরীতে। গত চব্বিশঘণ্টার মধ্যে হিন্দু যুবকেরা সংগঠন গড়েছে, ভেবেছে, নির্দ্দেশের অপেক্ষা করেছে, মুসলিম লীগের

তাণ্ডব থামবে ভেবেছে, অকস্মাৎ কিছু ক'রে বসেনি। কিন্তু মুসলিম লীগের বে-পরোয়া জনতা হিন্দুদের ওপর যদৃচ্ছা অত্যাচার করেছে, পুলিশ সার্জ্জেণ্ট সব দাঁড়িয়ে দেখেছে কিন্তু কিছু বলেনি, তারা থামাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি বরং অনেকক্ষেত্রে লুঠের মাল ভাগাভাগিতে ব্যস্ত থেকেছে। এ অবস্থায় হিন্দুসম্প্রদায় তার শিক্ষা, দীক্ষা, সৌজন্য বোধ নিয়ে চুপ ক'রে গেলেও, তার সাম্প্রদায়িকতাবাদী অংশ যে চুপ ক'রে থাকবে না সেকথা সুনিশ্চিত। সত্য মিথ্যা নানারকম গুজব রটিয়ে, বারুদে আগুন দেয়ার মত, আত্মরক্ষা বাহিনীগুলিকে তারা বিস্ফোরণের অবস্থায় নিয়ে গেছে। অন্যান্য এলাকায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সংগঠন থাকার ফলে অনেক আগেই সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছিল। নরেশের বড় গর্ব্ব ছিল অন্ততঃ তার এলাকায় সে কংগ্রেসের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হতে দেবেনা।

কিন্তু এই জনতার সাম্নে দাঁড়িয়ে সে বিশ্বাস যেন আর নেই। জনতা তাকে প্রশ্ন করল, আপনি আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন কি না?

অত্যন্ত চরম কথা। তবু নরেশ নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে বল্‌লে, না।

—কেন?

—কংগ্রেসের এ নীতিই নয় যে সে কারোকে আক্রমণ করতে বল্‌বে।

—রেখে দাও তোমার কংগ্রেস।

—না এই ভয়াবহ অবস্থায় কংগ্রেসকে আমরা রেখে দিতে পারিনা।

একজন লোক তড়াক ক'রে পাশের একটা দেউড়ীর উপরে উঠে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলে, ভাই সব! আপনারা দেখছেন চোখের সামনে কি ঘটে যাচ্ছে। প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দু-মেয়েদেব ওপর বলাৎকার চল্‌ছে, মেয়েদের স্তন কেটে উলঙ্গ অবস্থায় চুলের ঝুঁটি দিয়ে বারান্দায় বারান্দায়, গ্যাস্ পোষ্টে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে, হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে, আগুন ধরিয়ে দুর্ব্বৃত্তরা হিন্দুদের বিলুপ্ত ক'রে দেবার কাজে লেগে গেছে। আমরা যদি এ অবস্থায় 'মেনি' 'মেনি ক'রে শুধু আত্মরক্ষার কথা বলি তাহ'লে আমাদের চিরকালের জন্য সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। নরেশবাবু কংগ্রেসের কথা বল্‌ছেন—কিন্তু কংগ্রেস কবে বাংলার হিন্দুদের দিকে তাকিয়েছে? বাংলার হিন্দু চিরকাল অবহেলিত, অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত। যদি আজ বাংলার এই শ্রেষ্ঠ জাতিকে বাঁচতে হয় তবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে বাঁচতে হবে।

ঠিক কথা—ঠিক কথা জনতা সমর্থন করল।

লোকটি আবার বল্‌তে লাগল, নরেশবাবু কংগ্রেসের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কংগ্রেসের কোন্ নেতা বলেছেন যে তোমরা আক্রমণ কোরো না? শরৎবাবু বলেছেন, কিরণশঙ্করবাবু বা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ? বল্‌তে পারেন আপনারা কেউ, যে এসম্বন্ধে তাঁরা কিছু বলেছেন।

—না, না।

সেইজন্য, লোকটি বল্‌তে লাগ্‌ল, আমাদের ধরে নিতে হবে—আমাদের করণীয় কর্ত্তব্য কি? কাজেই মনে করো ভাই সব সেই আনন্দমঠের কথা, বন্দেমাতরমের ঋষির কথা—ভবানন্দ বল্‌ছেন 'ব্যাটাদের লুচির ময়দা তৈরী করো।' আজকে বাংলার হিন্দুকে তাই—

জয়হিন্দ—জয়হিন্দ, গুরুগর্জ্জনে জনতা মনের উল্লাস জানালো।

নরেশ আদর্শবাদী কংগ্রেস কর্ম্মী। লোকগুলোর এই সাম্প্রদায়িকতাবাদ কিভাবে গোটা একটা জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা সে চোখের সামনে যেন দেখ্‌তে পেল। তা ছাড়া কংগ্রেস নেতাদের নীরবতার কিরকম কদর্থই না কবল লোকগুলো!

দেখতে দেখ্‌তে কয়েক বোঝা তরবারি, ছোরা, ছুরি আর লাঠি এসে পড়ল। সে সব প্রকাশ্যেই সেখানে বিলি হতে লাগল।

আর দেরী নয় নরেশ ছুটল—এই তো অবস্থা—বি-পি-সি-সি অফিসে ফোন করতে হবে। বাংলার শিক্ষিত হিন্দুযুবক কখনো এমন ক'রে সাম্প্রদায়িকতার হলাহল পান করেনি। তার শিক্ষা, দীক্ষা সভ্যতা, সংস্কৃতির ঐতিহ্য বড় উজ্জ্বল। এমনি ক'রে তার অধঃপতন হবে? নরেশের দেশপ্রেমিক মন তাতে কিছুতেই সায় দিতে পারে না। পারলে সে একে রুখবেই।

ওসমান ও প্রবীর এসে দাঁড়িয়েছিল এই জনতার পিছনে। সবকিছু দেখল আর শুনল তারা। তারপর কর্ত্তব্যের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল দুজনেই।

ষোলই আগষ্ট দাঙ্গার সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ লীগেরই হাতে ছিল। কিন্তু চব্বিশঘণ্টা যেতে না যেতে উপদ্রুত অঞ্চলে সে উদ্যোগ একেবারে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। ষোলই আগষ্ট এমন কি সতেরোই আগষ্ট বিকাল পর্য্যন্ত বড় বড় রাস্তার সংযোগ স্থলে লড়াই চলেছে; ঠিক যেন সতেরোই বিকাল থেকেই মুসলিম লীগ জনতার পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হয়েছে।

এই পশ্চাদপসরণের ফলে মুসলিম লীগের লড়াইয়ের কায়দা বদলে গেল। জনতার লড়াই এলাকার লড়াইয়ে পরিণত হয়ে পড়ল। সুবিধামত আক্রমণ, সুবিধামত আত্মরক্ষা। আগের দিনে যেখানে মুসলিম লীগের ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে তলোয়ার ঘুরিয়েছে, পরের দিনে তাদের সেই ধ্বনি প্রতিপক্ষের কণ্ঠে 'লড়কে লেও পাকিস্তান' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

দাঙ্গার এই রূপান্তরে আর যাই হোক না কেন ক্ষতি হল সবচেয়ে নিরীহ শান্ত নাগরিক ও বস্তিবাসীদের। এলাকার লড়াইয়ে যেখানে যে সংখ্যায় বেশি সেখানেই সে সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞা নিল।

বাইরের জনতার লড়াই এলাকার লড়াইয়ে পরিণত হবার পর সবচেয়ে ঝড় নেমে এসেছে বস্তিগুলোর মাথায়। মুসলিম এলাকায় হিন্দুবাসিন্দাদের রীতিমত নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে আর হিন্দুএলাকায় মুসলমান বাসিন্দাদেরও ঠিক একই ভাবে বধ করা হচ্ছে।

তবু ওরি মধ্যে সমস্ত মানুষ যে হিংস্র বর্ব্বর হয়ে ওঠেনি, তারও বিস্ময়কর সব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই বিরাট দাবানল মহানগরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৎ, দেশপ্রেমিক ও মানবধর্ম্মী মানুষ মাত্রেই সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রেও একে অপর সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঁচিয়েছেন।

সবচেয়ে উৎসাহ ব্যঞ্জক খবর আসছিল সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক এলাকা থেকে। হিন্দু মুসলমান হলেও তারা শ্রমিক। শ্রমিকের একটা আদর্শ আছে, নীতি আছে। তারা পরস্পর মারামারি না ক'রে মেয়েদের হস্টেল, হিন্দু এবং মুসলমান মহল্লা দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে।

এইসব সংবাদগুলিকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। লোকের মনে পরস্পরকে বাঁচাবার একটা আগ্রহ দেখা দেবে। কিন্তু কিভাবে এই সংবাদগুলিকে ছড়ানো যায়? কোন সংবাদ-পত্রই সুস্থভাবে কোন কথা বল্‌তে পারছে না। সংবাদপত্রের নেতৃত্ব চলে গেছে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের দোহার 'ভারতবন্ধুর' হাতে। রাতারাতি সে হিন্দু সম্প্রদায়ের বন্ধু হয়ে উঠেছে।

বর্ব্বর সাম্রাজ্যবাদী মুর্ত্তির ওপরে মানবতার মোড়ক লাগিয়ে 'ভারতবন্ধু' মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে এতটুকু ইতঃস্তত করছে না। দেশের লোক এমন কি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গুলিও যেন ভুলে গেছে কিছুদিন আগেও সে কিরকম কংগ্রেস বিদ্বেষ প্রচার করেছিল আর মুসলিম লীগ নেতাদের কিভাবে তোয়াজ করেছিল। তার নীতিই হল একজনের পিঠ চাপড়িয়ে আর একজকে কোণঠেসা করা।

পথ থেকে একখানা সংবাদ পত্র এনেছিল ওসমান। একটা ধ্বংস-প্রাপ্ত মহল্লায় বসে দুই বন্ধুতে কাগজখানা পড়ছিল।

কাগজখানা পড়তে পড়তে ওসমান একেবারে ক্ষেপে উঠ্ল। গত রাত্রিতে হিন্দু ও মুসলিম জনতা দুটোকে বিভ্রান্ত করে মহল্লাটার হিন্দু পরিবার গুলিকে স্থানান্তরিত করবার পর যখন তারা দুই বন্ধুতে অন্যত্র যাচ্ছিলো তখন পথে একটা 'প্রেস-কার' দেখতে পেয়ে থামিয়ে তাতে উঠে পড়ে। তারপর কাগজের অফিসে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কতকগুলো বিবরণ দিয়ে আসে। কিন্তু যেখানে মুসলমানদের মানবিকতা ও মহানুভবতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, বিবরণের সেই সব জায়গাগুলি কেটে দেয়া হয়েছে। এমনি ক'রে অন্ধবিদ্বেষে সংবাদপত্রগুলো সত্যের কণ্ঠরোধ ক'রে চলেছে।

অথচ এমনিই অবস্থা। ওসমান পকেট থেকে 'ষ্টিকচক' বের ক'রে প্রবীরকে একটা দিলে আর নিজে একটা নিলে। তারপর বল্লে, চল্ আমরা বেরিয়ে পড়ি। এক-একটা

এলাকায় দেয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে দিয়ে লিখি মানুষের মহত্ত ফুটে উঠেছে যে সব এলাকায় সেই সব এলাকার কথা।

প্রবীর বল্‌লে, বেশ। কিন্তু তার আগে একটা কথা।

—কি ?

—কাল আমরা প্রেস থেকে ফেরবার পথে কি রকম ভুল করিছি দেখ্‌ছিস্ ?

—কি ?

দোকানে দোকানে শ্লিপ মেরেছি 'হিন্দুর দোকান' আর 'মুসলমানদের দোকান' কিন্তু ওপরের সাইন বোর্ডে আমাদের চালাকি ধরা পড়ে গেছে, ব'লে প্রবীর সামনের একটা সাইন-বোর্ড-ওয়ালা মুসলমান দোকানের দিকে আঙ্গুল দেখালো।

ওসমান বল্‌লে, ওরকম দুটো-একটা হবে কিন্তু তাকিয়ে ছাখ্ এখানের প্রায় অধিকাংশ দোকানই লুঠতরাজ থেকে বেঁচে গেছে।

তা গেছে, প্রবীর বল্‌লে, আমাদের কিন্তু আরেকটু হিসেব ক'রে চল্‌তে হবে।

হুঁ, ওসমান পা ফেলতে লাগল।

আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে কখন সূর্য্য উঠেছে। প্রচণ্ড কিরণে মহানগরী যেন তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির

এই আগুনে মিশে গেছে মানুষের মনেরও আগুন। একাকার এক অগ্নিময়ী আবেষ্টনী।

মিলিটারী লরী, রেডক্রসের গাড়ী সশব্দে পথ মুখরিত ক'রে ছুটে চলেছে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কয়েকটা দমকলের গাড়ীও ছুটে গেল।

ঘড় ঘড় করতে করতে ট্যাঙ্কও ছুটে চলেছে। পিছু পিছু কয়েকটা আমার্ড কারও। কি ব্যাপার—মনে হয় কোথাও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধেছে।

দূরে কোথায় যেন মেশিনগান গর্জ্জন করছে ব'লে মনে হল। হ্যাঁ মেশিনগানই। বড় রাস্তার ওপর ছত্রভঙ্গ জনতা হল্লা করতে করতে ছুটে আসছে। ধাবমান ট্যাঙ্ক তাড়া করেছে তাদের পিছনে। মেশিনগান গর্জ্জন করছে সমানে। জনতাও নীরব নয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আশ-পাশের গলিতে ঢুকে পড়ছে। গলির ভিতর দিয়ে কোন এক সাধারণ জায়গায় গিয়ে তারা আবার একত্র সমবেত হচ্ছে। তারপর আবার প্রতিপক্ষকে আক্রমণের ব্যবস্থা করছে।

ওরা দুজনে এসে পড়েছিল একটা মুসলমান মহল্লায়। মহল্লাটা চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বৃত্ত ক্রমশঃ ছোট ক'রে আনা হচ্ছে। পাছে মিলিটারী

এসে পড়ে সেইজন্য বৃত্তের বাইরে একটা দলকে রাখা হয়েছে। মিলিটারী এসে লড়াইটা বাইরেই হচ্ছে ভেবে সেইদিকেই যাবে। ব্যস তার মধ্যে এদিকে মহল্লাকে মহল্লা সাফ করে দেয়া হবে।

ওসমান ও প্রবীর বেরুবার জায়গা পাচ্ছে না। ওসমান পিস্তল তুটো ও সেই হাতবোমা আটটা প্রবীরের কাছে দিয়ে বললে, এগুলো তোর কাছে রাখ। হিন্দুজনতা আমাকে ধরে ফেলে এগুলো পেলে সমস্ত মুসলমানের জীবন আরও বিপন্ন হ'য়ে পড়বে।

প্রবীর হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিলে। ওসমান আবার বল্‌লে, এ বস্তির মুসলমানেরা সাবাড় হয়ে যাবে সব।

—কিন্তু কি করা যায় ?

—সেই তো।

প্রবীর বল্‌লে, আচ্ছা এক কাজ করা যায় না !

—কি ?

—পথে আস্‌তে আস্‌তে একজায়গায় যেমন দেখলাম একটা বস্তির লোক আরেকটা বস্তিতে শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়ে সন্ধি করলে, তেমনিভাবে ঝট্‌পট্‌ বস্তির কয়েকজন লোককে দিয়ে শান্তি প্রস্তাব পাঠালে হয় না ?

ঠিক বলেছিস্‌, ওসমান বল্‌লে, তুই এখানে হিন্দু জনতাকে রোখ। রুখে বোঝা। আমি বস্তির মাতব্বরদের ডেকে আনি।

লিখিত শান্তি প্রস্তাব দেয়া হবে—অবিশ্যি হিন্দুরা যদি চায় তো প্রতিভূস্বরূপও কয়েকজনকে রাখা যেতে পারে।

চারিদিক মথিত ক'রে চীৎকার উঠল, জয় হিন্দ্!

বৃত্ত ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে আসছে।

প্রবীর অসহায় বোধ ক'রল। চারিদিক থেকে আক্রমণ। কাজেই কোন দিককার লোককে সে বোঝাবে? একদিককার লোক হয় তো তার কথা শুনবে কিন্তু যদি আরেকদিক হতে আক্রমণ চলে? আর একবার আক্রমণ সুরু হ'য়ে গেলে তাকে রোখা বড় শক্ত। তখন কেউ কারো কথা শুনবে না। নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডে বীভৎস উল্লাসে মেতে উঠবে।

মুহূর্ত্তের চক্রধারায় সময় এগিয়ে চলেছে। প্রবীরের ভিতরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। অবিরাম গুরুগর্জ্জন চলেছে—জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্!

অবিশ্রান্ত কামানের গোলা বর্ষণ করতে করতে যেমন ক'রে এগিয়ে আসে বিজয়ী সৈন্যদল ঠিক তেমনি ক'রে এগিয়ে আসছে জনতা ইষ্টক বর্ষণ ক'রতে ক'রতে। বৃষ্টিধারার মত ইট পড়ছে চারিদিকে। অচল অটল ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়না। প্রবীরের পায়ের ওপর এসেই পড়ল কয়েকটা টুকরো। দু'এক জায়গায় কেটে গেল। এ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করতেই হবে—তা না হ'লে আগে সেই জখম হ'য়ে যাবে। জখম অবস্থায় আর কিছুই সে করতে পারবে না। বস্তিটার ঠিক প্রবেশপথেই একটা গাছ দেখতে পেয়ে প্রবীর সেদিকে

দৌড়লো। গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে যেন হাঁপাতে লাগল।

সুমুখে আস্‌ছে তার উন্মত্ত জনতা। আর এদিকে ভিতরে তার কি যেন এক হিম-শীতল দুর্ব্বলতা। হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে যেন। কাল থেকে খাওয়া নেই—তবুও যেন পেটের ভিতর থেকে গুলিয়ে উঠছে। হয়ত বমি হবে। বারকয়েক লোণাজলও উঠে এল মুখে। ঠোঁট ও জিবের যুগপৎ চাপ দিয়ে পিচ্ পিচ ক'রে জলগুলো মুখ থেকে ফেলে দিলে।

মানুষের জীবনে এমন এক-একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন তাকে যে কোন ব্যক্তিত্ববান মানুষের মতই বড় বড় কাজ করতে হয়। বড় কাজ করবার জন্য মানুষকে ঘষে-মেজে বড়মানুষ হতে হয় না। সঠিক মুহূর্ত্তে সঠিক কাজটি করতে পারলেই মানুষ ব্যক্তিত্ববান হয়ে ওঠে, বড় হয়ে ওঠে। সেজন্য শুধু মনটাকে আগে থেকে প্রস্তুত রাখতে হয়! প্রবীরের মন সেদিক থেকে প্রস্তুত কিন্তু কি ক'রতে হবে তাকে? এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝখানে কোন মুহূর্ত্তটিতে তার কি কর্ত্তব্য? প্রবীর, যেন আরও দুর্ব্বল হয়ে ওঠে।

ওসমান কাছে নেই! সে একলা। সুমুখে উদ্বেলিত জনসমুদ্র—উদ্দাম আর ভয়ঙ্কর হয়ে ছুটে আসছে। ঐ জনতার সুমুখে পথের ওপর বুক পেতে দিতে পারে সে, মরতেও পারে। হাতে আছে হাতবোমা আর পিস্তল—তাই দিয়ে কয়েক জনকে

হত্যাও করতে পারে। কিন্তু তাতে যে কাজের জন্য এইখানে এই বস্তির প্রবেশ-পথে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সেকাজের কতটুকু কি হবে?

দুর্ব্বলতা যেন ধীরে ধীরে কেটে গেল শরতের মেঘের মত। নবোন্মেষিত সূর্য্যের মত দীপ্ত-আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ল তার মনশ্চক্ষু। দেখতে পেলে নিজের ভিতরটা, দেখতে পেলে সে নিজের মধ্যে ধ্যানরত যেন এক মানুষ। প্রশান্ত হাসি হেসে নির্দ্দেশ করছেন, এগিয়ে চলো—

হাঁ এগিয়ে যাবে সে। চোখের নিমেষে সে ছুটে এল একেবারে জনতার সামনে। জনতা চীৎকার করে উঠল, জয়-হিন্দ—জয়-হিন্দ।

প্রবীর হাত তুলে চীৎকার ক'রে বলে উঠল, আপনারা থামুন—এ বস্তি আত্মসমর্পণ করেছে। আর বলেছে তারা লিখিত শান্তি প্রস্তাব দেবে হিন্দু-ভাইদের কাছে।

বিশ্বাস ঘাতকদের শান্তি প্রস্তাব আমরা মানব না—মানব না, জনতার একাংশ যেন ফেটে পড়ল।

তারা বল্‌ছে, প্রবীর বল্‌তে লাগল, যদি আমরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করি আপনাদের এই ধারণাই হয় তা হলে আপনারা জামিন-স্বরূপ আমাদের মাতব্বরদের হাতে রাখতে পারেন।

তাই নাকি, ব'লে উঠ্‌ল আরেক দল।

আরেকদল গর্জ্জন ক'রে বলে উঠ্‌ল, না না ওসব হাতে রাখারাখি নয়। ধরো আর মারো—

হ্যাঁ হ্যাঁ ধরো আর মারো, জনতা ফেটে পড়ল যেন, জয়-হিন্দ—জয়-হিন্দ।

আর বুঝি রোখা গেলনা জনতাকে। প্রবীর এবার শেষবারের মত আবেদন জানালো, যারা লিখিত শান্তি প্রস্তাব দিচ্ছে আমাদের কাছে, যারা তাদের মাতববরদের তুলে দিচ্ছে আমাদের হাতে—তাদের সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ, অবিশ্বাস হিন্দুর, গৌরব বৃদ্ধি করবে না বরং জাতি হিসেবে, সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের অধঃপতনেরই কথা ঘোষণা করবে।

—ওগো দয়ার সাগর তুমি থামো।

—দাদা কি কম্যোনিষ্ঠ?

একজন বলে উঠ্‌ল, লাল ঝাণ্ডা তোড় দেও—

—পি সি-জোশী নিপাত যাক্।

জনযুয্‌জু-উ-উ, বল্‌তে বল্‌তে একটা লোক কামাক্রান্ত জীব-জন্তুর মত কয়েকটা পাক ঘুরে নিলো। সেই বীভৎস জনতা হাসির হররায় ফেটে পড়ল। একজন বলে উঠ্‌ল, শালা—শনিবারের চিঠির ভাষায় ওরা শালা।

আগেকার রসিক বাংলাদেশ নূতনভাবে রসিক হয়ে উঠেছে। বীভৎস তাণ্ডবতার মাঝেও এদেশের জনতা এমনি করে রসিকতা শিখেছে। কতদিন ধ'রে নূতন ক'রে সাধনা করলে, আর কত হিমালয় থেকে আরম্ভ ক'রে ছোটখাট পর্ব্বতমালার নির্ঝর উৎস থেকে রস-সিঞ্চিত হলে তবেই দেশ এই রসিকতার শিখর দেশে পৌঁছতে পারে, সেকথা নিশ্চয়ই বিজ্ঞসমাজ ভাবতে সুরু

করেছেন। প্রবীর ভেবে পেলেনা এসব, এইসব অপ্রাসঙ্গিক কথা এখানে আছে কি ক'রে।

কিন্তু এমনি ক'রে সময় অতিবাহিত হ'লে জনতা লঘুচিত্ত হয়ে যাবে। তাই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জনতার ক্রোধবহ্নিকে উৎসাহিত ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, লীগের দালাল টালাল কাউকে রেহাই নয়। হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ চাই, হিন্দুর সম্পত্তি ধ্বংসের প্রতিশোধ চাই, হিন্দুর দুগ্ধ-পোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ চাই,—বলো ভাইসব, জয়-হিন্দ!

জনতা আক্রোশে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, জয়হিন্দ···

জয়হিন্দ···

জয়হিন্দ···

এগিয়ে চলো বস্তির মধ্যে—ঢুকে পড়ো···

প্রবীর বিচলিত হয়ে পড়ল। কি করবে সে? তার নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে রুখে দাঁড়াতে পারে কিন্তু একলা কি সে পারবে এই বৃহৎ জনতার গতিরোধ করতে? নাই পারুক, কিন্তু সে মরতে পারবে। তাকে যাক এই জনতা দলে পিষে মাড়িয়ে। শপথ করেছে সে, মরতে যখন হবেই—তখন মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েই সে মরবে। তাই মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে সে যদি মরে তবে সে হবে তার গৌরবের মৃত্যু। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক—ভারতের মাটির প্রত্যেকটি মানুষ তার ভাই, তার রক্ত, তার জীবনের জীবন। কাজেই সে মানুষকে সে মরতে দেবেনা

মুসলমান জনতার হাত থেকে হিন্দুকে বাঁচিয়েছে সে, হিন্দু জনতার হাত থেকেও মুসলমানকে বাঁচাবে। এই—এই তার কঠিন পণ। দেহের সর্ব্ব শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে সে রুখে দাঁড়ালো।

সহসা তার নজরে পড়ল জনতার প্রাচীর ঠেলে এগিয়ে আসছে, সেই লোকটি সেই প্রভাবশালী কংগ্রেসকর্ম্মী নরেশ। নরেশের পিছনে আরও কতগুলি লোক। দ্রুতবেগে এগিয়ে এসে সে বল্‌লে, আপনার কথাই ঠিক বন্ধু। অকারণ নরহত্যা নয়। হিন্দু-মুসলমান একবৃন্তে দুটি ফুল—একফুল ঝরে গেলে অন্য ফুল শুকিয়ে আসে। আমরা চাই শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়ে পাশাপাশি সদ্ভাবে বাস ক'রতে।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভিতর থেকে ঠাট্টা ক'রে উঠ্‌ল, বেড়ে বলেছ দোফলা রবিঠাকুর।

তার মানে, নরেশ রুখে উঠ্‌ল, কংগ্রেসের আদর্শকে, মর্য্যাদাকে আমরা ধূলোয় লুটিয়ে যেতে দোব না। তারপর পকেট থেকে একখানা জাতীয় পতাকা বের ক'রে বল্‌লে, আমার হাতে ভারতের মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক—এই পতাকা নিয়ে আমি তোমাদের পথ-রোধ ক'রে দাঁড়াবো, তোমরা যদি উন্মত্ত আবেগে আমার মুসলমান ভাইকে মারতে চাও তা হ'লে তার আগে আমাকে হত্যা করে এবং ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র জাতীয় পতাকার

অবমাননা ক'রে যেতে হবে। তৈয়ার থাকো—কদম কদম এগিয়ে এসো—

জনতার সামনে এতবড় চ্যালেঞ্জ ইতিমধ্যে আর কেউ বোধ হয় দেয়নি। প্রবীরকে কমিউনিষ্ট কল্পনা ক'রে বেশ শূন্যে ঘুসি ছোঁড়া যাচ্ছিলো কিন্তু একে তো কমিউনিষ্ট বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কোন-ঠাসা অবস্থায় এসে গেছে অনুভব করল।

আরও কোন-ঠাসা অনুভব ক'রল তারা যখন ওসমান জন পাঁচেক বৃদ্ধ বৃদ্ধ মুসলমান মাতব্বরকে শান্তির শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে এনে সামনে দাঁড় করালো আর নরেশ তাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করতে লাগল। আলিঙ্গনান্তে এক পক্ককেশ, পক্কশ্মশ্রু মুসলমানের হাত ধরে বলে উঠ্ল, ভাইসব এই বৃদ্ধ মুসলমান আমার দাদু—আমরা তার আদরের সিরাজ। যেদিন বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হয়েছিল এমনিতরো পক্ককেশ বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী বাংলার নাতি-নাত্নীকে সেদিন বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশ সে শিক্ষা ভোলেনি।

পক্ককেশ বৃদ্ধ অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে ব'লে উঠ্ল, খোদার কৃপা বর্ষণ হোক্ ভাই তোমাদের মাথায়। আজ আমার বল্‌তে ইচ্ছে করে, বৃদ্ধ একটু থামল। তারপর একহাতে ওসমানকে আরেকহাতে নরেশকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, আমার নাতির কথায় আমি যদি বাংলার মসনদের সেই বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দ্দী হই—তবে এই আমার মোহনলাল আর এই আমার মীরমদন। আজকে

শুধু আমি বল্‌ব, পলাশীর প্রান্তরে যে ঘৃণ্য নরপশুরা ডেকে এনেছিল ইংরেজকে—সেই মীরজাফরেরা জাহান্নমে যাক্‌।

জনতার মধ্যে থেকেও সমর্থন জানিয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল কেউ কেউ।

একটা বিরাট নরমেধ-যজ্ঞ যেন থেমে গেল।

আছে আশা আছে। এতবড় একটা সভ্যদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, তার ঐশ্বর্য্যময় ঐতিহ্য কখনও ধ্বংস হ'তে পারে না। মানুষমাত্রেই এ সবের সঙ্গে তার নাড়ীর টান অনুভব করবে। এই দেশেরই জল হাওয়ায়, এর আলো ছায়ায়, এই দেশেরই অন্নশস্যে গড়ে-ওঠা আর বেড়ে-ওঠা মানুষ কখনও ভ্রাতৃমেধ যজ্ঞের আত্মধ্বংসে এমন ক'রে পৈশাচিক তাণ্ডবকে অভিনন্দন জানিয়ে বা আবাহন করে ডেকে আনতে পারে না। তার মন চাইবে, প্রাণ চাইবে, তার শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্ত চেতনা চাইবে এর অবসান, চিরকালের জন্য অবসান।

এরা সেই মানুষ, সেই বস্তির দরিদ্র মানুষ—জাতির প্রাণধারাকে পূতিগন্ধময় বস্তির নর্দ্দমা আর আবর্জ্জনা থেকে যারা একান্ত সঙ্গোপনে সংরক্ষিত ক'রে রেখেছে। বাইরে থেকে এদের লোটা আর বদনাই হয় তো চোখে পড়ে—কিন্তু কোরাণ-শরিফ আর তুলসীদাস আজও এরাই মানে। হয় তো পাঠ করে নয় তো শোনে। তাই দু'শোবছরের বৃটিশ শাসনে বাসগৃহ হতে উৎখাত হলেও, দেশের মাটি থেকে এরা উৎখাত হয়ে যায় নি।

সত্যি বটে বিড়ি বেঁধে আর রাজ-মজুরের কাজ ক'রে, ডকে আর জাহাজ-ঘাটায় মেহনত ক'রে, ঠেলা ঠেলে আর রিক্স টেনে, বই বেঁধে আর লোহা কেটে এরা জীবন ধারণ করে—তাহলেও এদের জীবন "কাগজ নেড়ে উচ্চৈঃস্বরে পলিটিক্যাল তর্ক" করার বিষময় আবহাওয়ায় বিষিয়ে ওঠে নি।

বস্তির মধ্যে চলেছে ওসমান প্রবীর ও নরেশ। সেই বৃদ্ধ মুসলমান দাদু তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। বুড়ো এদিককার বিড়ি-মজুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। নাম শেখ আবদুল্লা।

মাথার ওপর খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর। আকাশের নীলিমা থেকে মাটি পর্য্যন্ত ছেয়ে গেছে শকুন। অতুল আনন্দে তারা পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। এমন উৎসব বুঝি তাদের জীবন আর কখনো আসে নি।

পথে যেতে যেতে আবদুল্লা বল্‌লে, আমার বিড়ি ইউনিয়ন সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে—লালঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু স্বপ্ন দেখিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের—তা গড়ে তোলবার জন্যে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রমও করিছি।

নরেশ বল্‌লে, সেইভাবে কঠোর পরিশ্রম করা আজ প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য দাদু। যে যাই হোক্—কংগ্রেস হোক, কমিউনিষ্ট হোক, সোশ্যালিষ্ট বা ফরোয়ার্ড ব্লক হোক, প্রত্যেকের আজ উচিত একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই বর্ব্বরতার অবসান করা। কেন না বর্ব্বরতায় যদি চারিদিক

ছেয়ে যায়—কংগ্রেস মরবে, কমিউনিষ্ট মরবে, সোশ্যালিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক সবাই মরবে। দেশে যদি সুস্থ আবহাওয়া না থাকে তবে কে শুন্‌বে আপনার আমার কথা। বর্ব্বরতায় বিষিয়ে ওঠা মানুষ অরণ্যের হিংস্র জানোয়ারের মত দেশের বুকে বিচরণ ক'রে বেড়াবে। তারা আপনার আমার সমস্ত কাজকে পণ্ড ক'রে দেবে।

এক সময়ে বস্তির মধ্যে তারা আবদুল্লা বুড়োর বাসায় এসে পৌছুল। ছোট্ট একটা দু-কামরার বাড়ী আবদুল্লার। বাড়ীঘর দেখে বুড়োকে অ-বাঙালী মুসলমান ব'লেই বোধ হয়। ভিতর দিককার ঘর থেকে একটি পাঞ্জাবী ও ওড়না পরিহিতা যুবতী মেয়ে এগিয়ে এলো। আবদুল্লা বল্‌লে, বিস্তারা বিছাও—

মেয়েটি এসে সতরঞ্চ বিছিয়ে দিল। প্রবীর দেখলে অদ্ভুত তো মেয়েটি। বাঙালী মেয়েদের মত লজ্জাও আছে, শালীনতা বোধও আছে—বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সতরঞ্চ বিছিয়ে দৃঢ় ভাবেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবদুল্লা বল্‌লে, বসেন ভাই সব।

নরেশ, ওসমান ও প্রবীর তিনজনে বসল। বসতেই বস্তির অন্যান্য মুসলমানেরাও এসে হাজির হ'ল। বাকী মাতব্বরেরাও এল। ঘরখানা ভরে উঠ্‌ল সকলের আগমনে। এমন দৃশ্য মহানগরে এই দাবানলের মাঝখানে সত্যই দুর্ল্লভ।

আবদুল্লা ভিতরকার ঘরে গিয়ে সেই মেয়েটিকে ডেকে

আনল। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্‌লে, এই আমার মেয়ে। এরই বুদ্ধিতে আমাদের পাশের চারজন হিন্দু ভাই জানে বেঁচে গেছে। মা আমার এ দেশের মেয়ে নয় ওর দাদুর কাছে পেশোয়ারে মানুষ হয়েছে। গায়ে অদ্ভুত জোর। লাঠির ঘায়ে চারজন হিন্দু ভাই পড়েছিল রাস্তায়, ও তাদের একলাই এক-একজন ক'রে বাড়ীতে তুলে এনেছে। এনে তাদের যত্ন সেবা করছে। কিছুক্ষণ আগে একদল গুণ্ডা এসেছিল কোন হিন্দুকে আমরা আশ্রয় দিয়িছি কিনা জান্‌তে, ও তাদের বোরখা পরিয়ে লুকিয়ে রাছে।

মেয়েটির সম্বন্ধে শুনে নরেশ, ওসমান প্রবীর এবং বস্তির মাতব্বরেরা অবাক হয়ে গেল। এমনিতরো উন্মত্ত তাণ্ডবের মাঝে কোথায় যে স্বচ্ছন্দ নীড় মানুষের জন্যে তৈরী হয়ে থাকে তা কে বল্‌তে পারে। মেয়েটি ঘাড় নীচু ক'রে আরক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। পাথরে কোঁদা নারী মূর্ত্তি যেমন দেখ্‌তে হয় তেমনি তাকে দেখতে। অবাক হয়ে সবাই তাব দিকে তাকালো।

নরেশ বল্‌লে, আজকে আমাদের দেশে তো এমনি মেয়েই দরকার।

সেলাম ভেইয়া, যেন হঠাৎই ব'লে মেয়েটি নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

মেয়েটি চলে যেতেই ওসমান যেন কি ভেবে ব'লে উঠ্‌ল, এখন কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

নরেশ বল্‌লে, হ্যাঁ—কিন্তু করা যাবে কি ?

এদিককার মুসলমান বস্তির মুসলমানদের আর ওদিককার হিন্দুবস্তির হিন্দুদের নিয়ে একটা অন্ততঃ কমিটি করা দরকার, ওসমান বল্‌তে লাগ্‌ল, আর সেই কমিটির লোকেরা পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে জনতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করুক।

ঘরের সবাই-ই কথাটাকে সমর্থন করল। নরেশ বল্‌লে, তাহ'লে তো আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়।

—হ্যাঁ।

প্রবীর বললে, তা হলে দাদু—

আবদুল্লা বললে, কে কে যাবে?

ওসমান বল্‌লে, আমি আর নরেশবাবু—

আবদুল্লা বল্‌লে, বেশ—

নরেশ আর ওসমান কথামত হিন্দুপল্লীতে গেল। প্রবীর আবদুল্লার ওখানে রয়ে গেল। ওরা ফিরলে তিনজনে আবার বেরুবে।

প্রবীর ইতিমধ্যে আবদুল্লার ঘরের ভিতরে গিয়ে চারজন আহত হিন্দুকে শুয়ে থাকতে দেখল। আবদুল্লার মেয়ে সলজ্জভাবে সকলের সম্বন্ধে বল্‌তে লাগল। প্রবীর অবাক হয়ে মেয়েটির এই দুঃসাহসিক ও মহৎ কাজের কথা ভাবতে লাগল।

মেয়েটি বল্‌লে, ভেইয়া ই কাম তো সব কইকো লিয়ে হ্যায়।

ই তো ঠিক বাত হ্যায়, প্রবীর বল্‌লে।

মেরা বাবা বিড়ি ইউনিয়ানকা প্রেসিডেণ্ট আছে, মেয়েটি

বলতে লাগল, ইয়ে ইউনিয়ন তো লাল ঝাণ্ডাকা ইউনিয়ন। পেশোয়ারমে ভি লাল ঝাণ্ডে ইউনিয়ন ম্যায় নে দেখা। মেরা নানা হুঁয়া কা জঙ্গী লীডার থে—

আবি বুড্ঢা জিন্দা হ্যায়, প্রবীর প্রশ্ন করল।

নেহি, মেয়েটি বল্‌লে, বড়া আফশোষ কি বাত—বুড্ঢা মর্ গিয়া।

এমনি ক'রে বহু কথা হ'ল মেয়েটির সঙ্গে। প্রথম থেকে মেয়েটিকে বেশ দৃঢ়-প্রকৃতির মেয়ে ব'লে বোধ হয়েছিল প্রবীরের—শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটিকে সে দেখ্‌লে, যতখানি দৃঢ় সে ভেবেছিল মেয়েটি যেন তার চেয়েও দৃঢ়।

আবদুল্লা গড়গড়া এনে বসল ওদের সামনে। এই দাঙ্গা তার মনের শান্তি নষ্ট ক'রেছিল। দুদিন সে তামাক খায় নি। আজ আবার উৎসাহ ভরা ঘটনায় সে যেন খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। তাই নিজেই তামাক সেজে বুড়ো নিজের হাতে অগ্নি-সংযোগ ক'রে নল লাগিয়ে টান্‌তে লাগল।

মহানগরের এই উদ্দাম গৃহযুদ্ধের মাঝে এ যেন এক শান্তির নীড়। প্রবীরের মনটা আশার আনন্দে দুলে উঠ্‌ল।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল ওসমান আর নরেশ অনেকক্ষণ গেছে। এখনও তো ফিরল না!

কোথায় যেন একটা উন্মত্ত কোলাহল শোনা যাচ্ছে। মেশিনগান, রাইফেলও গর্জ্জে উঠছে মাঝে মাঝে। বড় রাস্তা দিয়ে বুঝি ট্যাঙ্ক, আমার্ড কার প্রভৃতি ছুটে চলেছে। দূর

আকাশে দেখা যাচ্ছে ধূম্রকুণ্ডলী যেন পাকিয়ে পাকিয়ে মহাশূন্যে কোন অদৃশ্য-লোকের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। হয় তো এখুনি আবার বেরুতে হতে পারে। কিন্তু ওরা না এলে সে কি ক'রে যায়?

কাল থেকে কিছু খাওয়া নেই। এই দীর্ঘ দু'দিন সময়ের মধ্যে প্রবীরের খিদের কথা মনেই পড়ে নি কিন্তু যে মুহূর্তে সে অনুভব করল একটা নিশ্চিন্ত-শান্তির গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছে, সেই মুহূর্তেই যেন পাকস্থলীটা সমস্তটা একসঙ্গে নড়ে উঠ্‌ল। তা ছাড়া তখনই তার মনে হ'ল যে এখনও ঝড়ের মধ্যে দিয়ে তাকে কত ঘুরতে হবে। তাই কিছু যেন খাওয়া দরকার।

কিছুক্ষণ মনে দ্বন্দ্ব চলল—সে এদের কাছে খাবার চাইবে কি চাইবে না। কেননা দাঙ্গার ফলে মানুষের ঘরের খাবার যা ছিল তা ফুরিয়ে গেছে, বাজার থেকে নতুন ক'রে আনবার কোন পথ নেই। এ অবস্থায় কোন গৃহস্থকে খাবার চেয়ে, তাদেরও লজ্জা দেয়া, নিজেরও চাওয়ার দীনতা প্রকাশ পাওয়া। কিন্তু ক্ষুধার কাছে মানুষের কোন বিচার চলে না, বিশেষ ক'রে যাদের খাটতে হবে তাদের খেতেই হবে। না খেলে তাদের যা ক্ষতি হবে, তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি হবে কাজের। সেজন্যে খাওয়ার একটা ন্যায়সঙ্গত চাহিদা আছে। তাই প্রবীর জীবনে যা করে নি তাই আজ ক'রে বস্‌ল। আবদুল্লাকে বল্‌লে,

দু'দিন আমাদের খাওয়া হয় নি—দাঙ্গার মধ্যে মানুষ উদ্ধার করতে করতে ঘুরে বেড়িয়েছি।

আবদুল্লা তামাকের নল ছেড়ে দিয়ে সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ল, দু'দিন কিছু খান নি?

—না

বুড়ো তৎক্ষণাৎ মেয়েকে ডাকলে। ডেকে বললে, দো রোজ ইন্‌ লোগনকো খানা মিলা নেই বেটি—আভি তুম বন্দ্‌বস্ত ক'র্‌ দেও। নরেশবাবু আউর ওসমান বাহার গিয়া, আবি আ যায়েঙ্গে। পহেলে ইন্‌কো থোড়া মেওয়া আউর রোটী দে দেও—

মেয়েটি বলে উঠল, ভেইয়া ই তো বড়া আফশোষ কি বাত হ্যায়। কাহে নেই আপ বোলা?

প্রবীর লজ্জিতভাবে মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটি বল্‌লে, আতা হুঁ।

প্রবীর খেতে বস্‌তেই কোথাকার সেই কোলাহলটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। চীৎকার আর আর্ত্তনাদ, তার সঙ্গে রণধ্বনি—সব মিলে যেন কি রকম একটা বীভৎস শব্দ সমষ্টি বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রবীরের হাতের খাওয়া হাতেই রয়ে গেল। সে কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌ল।

ইতিমধ্যে নরেশ এবং ওসমান এসে পড়ল। ওদের সঙ্গে ছিল হিন্দুপল্লীর জন দুই বিশিষ্ট ভদ্রলোক। নরেশ তাদের এনে বল্‌লে, এই বুড়ো আবদুল্লা—এঁর সঙ্গে আলাপ করুন; ক'রে তারপর হিন্দু ও মুসলমান পল্লীর প্রতিনিধি নিয়ে যুক্ত-

কমিটি পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করুক—দাঙ্গার এই সর্ব্বনাশা আবহাওয়া তবে ঠাণ্ডা করা যাবে। আমরা কিন্তু দেরী করতে পারব না। ওদিকে—

আবদুল্লা বল্‌লে, কিন্তু তার আগে একবার ভেতরে যেতে হবে।

নরেশ জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

আবদুল্লা বল্‌লে, কথা আছে।

প্রবীর যেখানে বসে খাচ্ছিল, সেখানে নরেশ আর ওসমান যেতেই, সকলে মিলে হেসে উঠ্‌ল।

ওসমানের খুবই খিদে পেয়েছিল। সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বসে পড়ল। নরেশও ক্ষুধার্ত্ত। ওসমানের দেখাদেখি সেও বসে পড়ল।

খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে প্রবীর বল্‌লে, কোনদিক থেকে গোলমাল আস্‌ছে বল্‌দিকি ওসমান ?

ওসমান কোন উত্তর দিলে না। উত্তর দিলে নরেশ। সে বল্‌লে, ওদিককার একটা বস্তি অঞ্চল থেকে মনে হচ্ছে যেন।

ওসমান ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো।

নরেশ বল্‌লে, আমাদের তো বেরুতে হয় এরপর।

কোলাহলটা যেদিক থেকে আস্‌ছিল, সেইদিকে ছুটেছে সারি সারি সব ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড কার, মিলিটারী এগুচ্ছে দু'পাশে গুলী চালাতে চালাতে। রাস্তায় তিষ্ঠোয় কার সাধ্যি ! নরেশ ওসমান আর প্রবীর এ অবস্থায় কি ক'রে এগুবে ? তারা

আশ্রয় নিলো একটা বাড়ীর ভিতরে। বাড়ীটায় সম্ভবতঃ কেউ ছিল না। ওসমান তাড়াতাড়ি দ্বিতলে উঠে পড়ে দেখলে কোথায় কি হচ্ছে! কিন্তু দূর থেকে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না—শুধু আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত ক'রে মেঘের মত ধূম-কুণ্ডলীর সীমাহীন বিস্তৃতি।

নরেশ বল্‌লে, কি দেখছেন ?

—শুধুই ধোঁয়া।

—তা হলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নাকি ?

—সম্ভবতঃ

প্রবীর বল্‌লে, সম্ভবতঃ কেন—নিশ্চয়ই।

নরেশ বল্‌লে, আমারও তাই মনে হয়।

পথে পথে সারি সারি ট্যাঙ্ক চলেছে ঘড় ঘড় করে। আর্মার্ড কারগুলো কেন কি জানি, সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

নীচে নেমে এল ওসমান। এসেই সে বল্‌লে, দাঙ্গাটাকে আমরা যারা প্রত্যক্ষ করছি, কখনও তারা ভুল্‌তে পারব না কি চক্রান্ত ছিল এর পিছনে।

নরেশ বল্‌লে, কেন ?

সোজা দেখ্‌তে পাচ্ছি সাম্রাজ্যবাদের সূক্ষ্ম হস্ত রয়েছে এর পেছনে, ওসমান বল্‌তে লাগল, ধর্ম্মতলা হত্যাকাণ্ডের দিন, রসিদ আলী দিবসের ব্যাপার স্মরণ করুন তো—রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দিলো সারা কলকাতাটা এই মিলিটারী, এই সাম্রাজ্যবাদই সেদিন শান্ত ক'রে আন্‌ল অবস্থা! কিন্তু একি,এই যে সারি সারি

নাৎসী ফ্রন্টের মত ট্যাঙ্ক ছুটেছে, আর্মার্ড কার ছুটেছে, গোলা-গুলী, টমি গান, রাইফেল, লুইসগান, মেশিনগান, চলেছে—এ কি সত্যিকারের কোন কার্য্যকরী পন্থা বলে মনে হচ্ছে ?

নরেশ বল্‌লে, গোড়া থেকে এটা যদি করতে পারতো তা হলে না হয় বুঝতুম।

গোড়া থেকে তো করেই নি, ওসমান বল্‌তে লাগল, কিন্তু এখন ব্যবস্থা করেই বা কি করছে ? নির্ব্বিচারে গুলী চালানোটাই কি দাঙ্গা থামাবার সবচেয়ে বড় উপায় ? এতে শুধু মৃত্যুসংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর কি হচ্ছে ?

—বাস্তবিক !

প্রবীর বল্‌লে, যে চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছে ক্যাবিনেট মিশন আসার সঙ্গে এ তো সেই চক্রান্তেরই ফল ! গোড়ায় মিলিটারী দিলে না বলে আর লাভ কি ভাই ?

নরেশ বল্‌লে, কিন্তু প্রবীরবাবু এইখানেই এর শেষ নয়। ক্যাবিনেট মিশনের চালাকির ফলে দাঙ্গা বেধেছে ঠিকই। কিন্তু এই যে দাঙ্গা এত তীব্র—এ কিন্তু আরও ইন্ধন পেয়েছে।

যে কোন সংস্কার মুক্ত মানুষই তাই বল্‌বে নরেশবাবু, প্রবীর বল্‌তে লাগল, ঝানু সাম্রাজ্যবাদী ক্যাবিনেট মিশনই এই দাঙ্গার জন্যে দায়ী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লীগ-নেতৃত্ব, কোটিপতি কারখানা-ওয়ালারা, আর বস্তির মালিকেরা তারা ইন্ধন জুগিয়েছে তবে এই রকম বর্ব্বরের মত মানুষ ক্ষেপে উঠেছে। লীগনেতৃত্ব ভেবেছে কংগ্রেসকে খুব জব্দ করে দেয়া যাবে, কারখানাওয়ালারা

ভেবেছে হিন্দুমুসলমান রেষারেষি হলে সম্প্রতি সর্ব্বত্র যে ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে সেগুলো ভেঙে যাবে, আর বস্তির মালিকরা ভেবেছে, এমনি বস্তির লোকগুলোকে উচ্ছেদ করা যায় না, আইনতঃ তারা বাস করতে পারে, এই দাঙ্গাই হচ্ছে তাল। তা ছাড়া তারা স্বপ্ন দেখেছে ঐ জায়গাগুলোয় বিরাট ফ্লাট বাড়ী তোলার—পুরুষানুক্রমে অন্ততঃ তারা ভাড়া খাটিয়ে খেতে পারবে। তাই এরা সবাই মিলে দাঙ্গার পিছনে অর্থ-সামর্থ্য জুগিয়েছে, আর তাই দাঙ্গা এত তীব্র হয়ে উঠেছে।

ওসমান বল্‌লে, শুধু কি তাই এমন কি অস্ত্রশস্ত্রও। যেখানেই দেখি সব জায়গাতেই এক ধরণেরই অস্ত্র। হিন্দু-এলাকায় বেশির ভাগ হিন্দু অস্ত্র একই রকমের, মুসলমান এলাকায় মুসলমানদের অস্ত্রের মধ্যেও বেশ মিল রয়েছে। তা ছাড়া লীগ যেমন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস ও হিন্দু-জনসাধারণের বিরুদ্ধে তেমনি,······ওসমান একটু থাম্‌ল। থেমে পুনরায় বল্‌লে, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের মধ্যেও বেশ একটা অংশ মনে করেছে লীগই তাদের শত্রু এবং কেউ কেউ প্রকাশ্যে এসব কথা বলেও ফেলেছেন। তা ছাড়া হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তো আছেই—সে আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ ক'রেছেন।

অবিশ্যি কংগ্রেসের মধ্যে, নরেশ বল্‌লে, আপনি যেরকমের বল্‌লেন—ওরকমের লোক যে নেই তা নয়। তবে সবাই তা নয়—

তা তো নয়ই, ওসমান বল্‌লে, আর আমি সে কথা বল্‌বও না।

আসলে কথা কি জানেন, নরেশ বল্‌তে লাগ্‌ল, ক্ষুধিত বাঘের সামনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ফেলে দিয়েছে একটুক্‌রো রুটি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুধার্ত্ত আমরা সেই রুটির টুক্‌রো কার ভাগে পড়বে তাই নিয়ে মারামারি ক'রে মরছি। টুক্‌রো রুটিটাকেই কংগ্রেস ভাব্‌ছে এ যেন আর কেউ না নিতে পারে, লীগ ভাবছে কংগ্রেসের হাতেই সব চলে গেল অতএব তার জন্যেই তাদের সংগ্রাম।

প্রবীর বল্‌লে, এই হয়েছে আসল কথা!

নরেশ এবার যেন একটু আবেগ ভরেই বলে উঠ্‌ল, কিন্তু এ যে আসল কিছু নয়—একথা আমরা ভাবতে পারছি না। আর পারছি না বলেই নিজেদের মধ্যে মারামারি থামিয়ে আমাদের আসল শত্রু সাম্রাজ্যবাদকে আমরা আঘাত করতে পারছি না।

বাস্তবিক আপনার মত কংগ্রেসকর্ম্মী আমরা খুব কম দেখেছি, ওসমান বলে উঠ্‌ল, আমার জীবনে আমি কখনও ভুলব না।

অন্যধরণের কংগ্রেসকর্ম্মীর সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না, নরেশ বলতে লাগল, জানেন তো কংগ্রেসের মধ্যে অনেক দল আছে? আমাদের দলটা হচ্ছে বাংলাদেশে সব চেয়ে ছোট। আমাদের নেতৃত্ব কর্পোরেশনের কংগ্রেস-নেতাদের

মত দেউলিয়া হয়ে যায় নি তার কারণ আমাদের সত্যিকারের যোগ আছে জনসাধারণের সঙ্গে। হুগলী জেলায় আমাদের দল খুব শক্তিশালী। এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসে আমরাই কংগ্রেসের মধ্যে একমাত্র দল যারা হুগলী জেলায় ষোলই আগষ্ট হরতাল করবার নির্দ্দেশ দিই। কেন না আমরা লীগের সিদ্ধান্তের মধ্যে দেখেছিলাম গৃহযুদ্ধের বীজ। একসঙ্গে হরতালের নির্দ্দেশের ফলে হুগলী জেলায় বিরাট শিল্পাঞ্চলে দাঙ্গা বাধে নি। আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতেও এইভাবে নির্দ্দেশ দেবার দাবী জানিয়ে ছিলাম কিন্তু সেকথায় নেতারা কেউ কর্ণপাতই করেন নি।

ওসমান প্রশ্ন করল, কেন ?

যেহেতু তাঁদের জনসাধারণের সঙ্গে যোগ নেই। নরেশ বল্‌তে লাগল, আমরা বলেছিলাম লীগ যখন দোকান বন্ধ করতে বল্‌বে তখন যদি দোকান খোলা রাখা হয় তা হলে সংঘর্ষ তো অনিবার্য্য। তাই যারা দোকান খুলে রাখবে তাদের কি প্রোটেকসন দেওয়া হবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ? সেকথা অন্যান্য কংগ্রেস কর্ম্মীরা হিসাবের মধ্যেও আনেন নি—মানে আনতে পারেন নি।

তা হ'লে এতখানি গড়িয়েছিল, ওসমান বললে।

নরেশ বললে, হ্যাঁ।

নরেশ সম্বন্ধে প্রবীরের ধারণা উঁচু হয়ে গেল। এই তো

চাই, এমনিতরো কংগ্রেসকর্ম্মী না হ'লে কংগ্রেসের সুনাম বজায় থাকে !

রাস্তা তখনও মুক্ত হয়নি। আর্মার্ড কারগুলো সারি সারি তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে ট্যাঙ্ক গুলো ঘড় ঘড় করতে করতে ছুটে যাচ্ছে। আকাশে যেন আবার মেঘ জমেছে। হয় তো বৃষ্টি হবে, হয় তো উঠবে ঝড় কিম্বা হয় তো বেধে যাবে নতুন ক'রে আরেক প্রলয়। সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে এমনি একটা অবিশ্বাস আর আতঙ্ক। এ থেকে মুক্ত হবার যেন কারও সাধ্য নেই।

নরেশ বল্‌লে, কথায় কথায় তো আমার নিজের পরিচয় আপনাদের দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আপনাদের তো ভাল মানুষ ছাড়া আর কোন পরিচয় পেলাম না ?

ওসমান একটু হাসল।

প্রবীর ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, কি দরকার ?

দরকার, নরেশ নিতান্ত বন্ধুর মতই বলূলে, দরকার আছে বৈ কি! হয় তো আমাদের মত ও পথ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আজকে এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের দোলায় নৌকা বাইতে গিয়ে যাদের পেলাম তাদের পরিচয়ে দরকার নেই তো দরকার তবে কাদের পরিচয়ের ?

ওসমান বল্‌লে, আমি বহু-নিন্দিত-লীগ কর্ম্মী।

লী-গ ক-র্ম্মী, সবিস্ময়ে নরেশ ব'লে উঠল, ওসমান সাহেব লীগ-কর্ম্মী!

হ্যাঁ বন্ধু, ওসমান হাত বাড়িয়া দিলে নরেশের দিকে। নরেশ হাত বাড়িয়ে করমর্দ্দন করল ওসমানের সঙ্গে।

সত্যিই ওসমান সাহেব, নরেশ বল্‌লে, আপনি আজ আমায় বিস্মিত করলেন। লীগের মধ্যে আপনার মত মানুষ যে আছে, একথা অমি কোনদিনই ভাবতে পারিনি।

এইবার ভাবুন, হাসতে হাসতে ওসমান বল্‌লে, আপনারা যেমন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের বোঝাতে পারেন নি ষোলই আগষ্ট হরতালের সময়, আমরাও তেমনি পারি নি আমাদের নেতাদের এই হিন্দু ও কংগ্রেস বিরোধী সংগ্রাম থেকে ফিরিয়ে আনতে। আমাদের উভয়ের অক্ষমতাতেই এই অমানুষিক বর্ব্বরতা প্রশ্রয় পেয়ে গেছে।

প্রবীর বলে উঠল, সত্যিই।

কিন্তু আপনার পরিচয়টা, নরেশ প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে।

প্রবীর একটু হাসল। তারপর বল্‌লে, পরিচয় দেবার মত আমার কিছু নেই।

—সে কি একটা কথা হল?

—না না।

ওসমান বল্‌লে, আচ্ছা আমিই ওর পরিচয় ক'রে দিচ্ছি। প্রবীর একজন দুঁদে টেররিষ্ট ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বিপ্লবী বীর সূর্য্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষের সঙ্গে ও যোগ দেয়। জালালাবাদ, কালারপুলে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে লড়াই ক'রে ওর সাথীরা সব মারা যায়—ও তখন একা একা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তারপর ধরা পড়ে দ্বীপান্তর হয়। রোগাক্রান্ত অবস্থায় ও মুক্তি পায়। মুক্তি পাওয়া অবধি ও খুঁজছিল ওদের পুরোনো দলের কোন অস্তিত্ব আছে কি না। দলের অধিকাংশ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। অম্বিকাবাবু, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিও তাই। ও কমিউনিষ্ট পার্টিতেই যোগ দেবে কি দেবে না—এই সব যখন ভাবছিল, এমন দিনে লাগল ক্যাপ্টেন রসিদ আলী দিবসের বিক্ষোভ। ওর তখনও টেররিষ্ট মনোভাব যায় নি। সাহেব মারার জন্য ক্ষেপে উঠল।

প্রবীর বিরক্ত ভরে বলে উঠল, বাবা রাখ তোর মহাভারত। এখন চ ওদিকে ঐ বস্তি অঞ্চলটায় সম্ভবতঃ খুব জোর বলি চলেছে!

নরেশ কিন্তু ব'লে উঠল, তারপর তারপর ওসমান সাহেব?

তারপর আর কি, ওসমান বলতে লাগল, সেদিনকার সেই উত্তাল উদ্দাম গণ-বিক্ষোভ দেখে মাথা গেল ঘুরে। একটা সাহেব মারার শক্তির চেয়ে সেই প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভের শক্তি

যে কত তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কি মনে ক'রে যে ও পথে বেরিয়েছিল তা ঐ জানে। হঠাৎ পথে দেখা হল আমার সঙ্গে। ছেলেবেলায় আমরা চট্টগ্রামে একসঙ্গে পড়াশুনো করি। সেই পরিচয়ই আমাদের পরস্পরের কাছে হয়ে উঠল নিবিড়। রসিদ আলী দিবসে দুজনে একসঙ্গে অভিযানে মেতে উঠলুম। আর তারপর এই কাল থেকে—

শেষটা বল, প্রবীর বল্‌লে, আমি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলুম একটা মেস বাড়ীতে। উনিই আমায় উদ্ধার ক'রে এনেছেন।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

নরেশ প্রশ্ন করল, প্রবীরবাবু কি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন নাকি ?

—এখনও দিইনি।

কমিউনিষ্ট পার্টির কার্য্যকলাপ আমার বেশ লাগে, নরেশ বল্‌লে, কিন্তু কেন কি জানি মনের কোণে কোথায় যেন একটা সন্দেহ রয়ে গেছে। এই তো এমন বিপদের দিনে আমরা পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছি অথচ কেন যে—

হ্যাঁ—অথচ কেন যে, প্রবীরের বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সকলের অজ্ঞাতে যেন বাইরে আছড়ে পড়ল।

ওসমান বল্‌লে, কিন্তু আর নয়—মিলিটারী প্রায় রাস্তাটা খালি করে দিয়েছে। নরেশ বল্‌লে, তাতো দেখছি।

প্রবীর বল্‌লে, কিন্তু যেভাবে আজ মিলিটারী চলেছে এতে তো হেঁটে যাওয়া যাবে না!

তা'হলে, প্রশ্ন করল নরেশ।

ওসমান বললে, এককাজ করলে হয়। বাড়ীটার পাশে একটা মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে দেখছিলাম। এ তল্লাটে তো কোথাও লোক দেখছি না—গাড়ীখানা বোধ হয় বেওয়ারিশ!

প্রবীর বল্‌লে, আছে কি গাড়ীটা?

দাঁড়া দেখি, ওসমান তড় তড় ক'রে ওপরে উঠে গেল। গিয়ে পাশের বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখে বললে, গাড়ীখানা ঠিকই আছে রে!

—ছাখ আবার পেট্রোল-ফেট্রোল আছে কিনা!

কিন্তু চালাবে কে, নরেশ জিজ্ঞাসা করল। ওসমান ততক্ষণে নেমে এসেছিল। সে বল্‌লে, কেন প্রবীর।

—প্রবীরবাবু গাড়ী চালাতে জানেন?

আর্মারি রেডের পর আমার মামলায় পুলিশের এইটেই তো একটা মস্তবড় প্রমাণ ছিল। অনন্তদা আমাকে নিজে হাতে ক'রে গাড়ী চালানো শিখিয়েছিলেন।

অতঃপর গাড়ীটাকে দখল করাই সাব্যস্ত হ'ল। নীচে এসে গাড়ীটার ভিতরটা দেখে, তারপর পেট্রোল ট্যাঙ্কটা ঠিক আছে কিনা ভাল ক'রে পরখ ক'রে নিয়ে প্রবীর ষ্টীয়ারিং হুইলের সামনে এসে বসল। গাড়ীটার ভিতরে একটা হ্যাণ্ডেল ছিল।

প্রবীর বাঁহাতে ক'রে সেটাকে তুলে ওসমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, হ্যাণ্ডেল মারতে পারবি ?

—তা পারব।

—ত্মাখ্।

ওসমান হ্যাণ্ডেল মারতে গেল।

হ্যাঁ সেই বস্তি অঞ্চলটাতেই বটে। পূবদিক দিয়ে বস্তিটার পথ। শুধু এই পথের দিকটা বাদ দিয়ে উত্তরে দক্ষিণে আর পশ্চিমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিরাট অগ্নি-পর্ব্ব। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে হত্যাপর্ব্ব, ঘর দোর ছেড়ে অসহায় নর-নারী প্রাণভয়ে নেমে পড়েছে বস্তির পথে পথে। নির্ব্বিচারে চলেছে পাশব তাণ্ডব।

অসহায় বস্তির মেয়ে, হ্যাঁ, শুধুই অসহায়—পথে-পথে অলিতে-গলিতে তাদের ফেলে ফেলে চলেছে উন্মত্ত পাশবিকতা। এমন ব্যাপক নারীধর্ষণ পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় আর কখনো ঘটে নি। তারওপর কারোকে টেনে আনা হচ্ছে চুলের মুঠি ধ'রে, কারোকে উলঙ্গ ক'রে, কারো বা স্তন ছুটো ধরে। বস্তির মাটির সবুজ শ্যাওলায় রক্তধারা বইয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের স্বামী আর পুত্রকন্যাদের, ভাই আর বোনেদের।

চারিদিকে সারি সারি শব পড়ে। বিস্ফারিত চাহনি মিলে তারা দেখে—কারো মুণ্ড নেই ধড়ে, কারো হাত পা নির্ম্মূল

করা, কারোকে মাঝামাঝি চিরে ফেলা, কোন কোন শবের গায়ে শিল্প প্রতিভারও প্রকাশ দেখা যায়।

মূহূর্ত্ত মধ্যে মেয়েগুলোরও অবস্থা এমনিতরো হবে। তবু বাঁচবার অসীম আগ্রহে সেই উন্মত্ত পশুদের পা জড়িয়ে ধরে আর্ত্তনাদ-বিকৃত কণ্ঠে মেয়েগুলো ব'লে ওঠে, তোমরা আমাদের বাপ গো—বাপ।

—ধ্যেৎ তোর বাপের নিকুচি করেছে।

এমন সময় তীব্র বেগে মোটরে ক'রে এসে পড়ল প্রবীর ওসমান ও নরেশ। প্রবীর ঝপ্ করে গাড়ী থেকে নেমেই পিস্তল বাগিয়ে ধরে ব'লে উঠল, গুলী করব।

এপাশে আগুন—ও পাশে আগুন! আগুন প্রায় সর্ব্বত্রই! লোকগুলো তারই ভেতর দিয়ে সোল্লাসে পালালো!

সহসা বস্তির সামনের দিককার আকাশ হতে ভেসে এলো যেন একটা বীভৎস অট্টহাসি, হাঃ-হাঃ-হাঃ-হা-হাঃঃ···

ওরা তিনজনেই সেদিকে তাকালো। দেখল দূরে একটা গগনচুম্বী প্রাসাদ—তারই ছাদে মেট্রো ধাঁচের প্যারাপেটের খাঁজে বাঁহাতের বন্দুকটা ঠেসিয়ে একজন টেকো বুড়ো—টাকের চার পাশে তার পাতলা চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠেছে—হিটলারের মত উর্দ্ধে হাত তুলে চীৎকার করছে, সাবাস—সাবাস জোয়ান।

পাশে দাঁড়িয়েছিল সম্ভবতঃ টেকো-বুড়োর স্ত্রী। এই পৈশাচিক তাণ্ডবে, সেও ধ্বংসের দেবীর মত উল্লসিত। নারী

হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য তার অবলুপ্ত। হাসির হর্‌রায় বুড়ী যেন খুকি সেজে ওঠে।

সামনে বস্তিটা দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। হত্যার অপেক্ষায় যে মেয়ে গুলো ছিল, তারা সেই আবেষ্টনীর মধ্যে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। আর ওদিকে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে বুড়ো বুড়ী রক্তাক্ত-পৈশাচিকতার এই পটভূমিতে হয় তো দেখছেঃ এখানটায় বাঁশের ছেঁচায় কাদাধরানো আর খোলায় ছাওয়া ঘর গুলো নেই —প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ত্রিপলের তাঁবু ফেলে বসেছে বড় বড় কনট্রাক্টর। এদিক-সেদিকে চেয়ার আর টেবিল, হাফপ্যাণ্ট আর শোলার টুপি মাথায় অসংখ্য লোক, মেজার-টেপ নিয়ে মাপছে, হিসেব করছে, কুলী খাটাচ্ছে, তাঁবুগুলোর ভিতর কোম্পানীর অফিসাররা মূল নক্সা নিয়ে কুঞ্চিত ললাটে কি যেন ভাবছে। স্বপ্ন বুঝি আর বেশি দূরে নয়। একদিন এখানে প্রাসাদোপম ফ্ল্যাট বাড়ী উঠবে, পুরুষানুক্রমে বস্তির মালিকেরা সেই ফ্ল্যাটের ভাড়ায় খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে।

প্রবীর বল্‌লে, এই তো বস্তি উচ্ছেদের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা।

নরেশ বল্‌লে, তাইতো দেখছি।

ওসমান বল্‌লে, কিন্তু আর দেরী করলে চল্‌বে না। আগুন যেন লক্ লক্ করতে করতে এগিয়ে আসছে। এখুনি মোটরটাতে এসে লাগবে। কাজেই তার আগে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

হ্যাঁ যে কটা মেয়েছেলে বেঁচে রয়েছে, প্রবীর বল্‌লে, তোল গাড়ীতে। তারপর—

তাই ঠিক হল। গাদাগাদি করে মেয়েগুলোকে গাড়ীতে তোলা হল। তারপর প্রবীর ছুটিয়ে দিলে মোটরখানা।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলল মোটর।

বস্তিটা থেকে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে আনবার পর অচিন্তনীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেল। যেখানটায় তারা ছিল সেখানটায় হঠাৎ একটা বাইরেকার জনতা এসে পড়ল। ট্যাঙ্ক আর্মার্ড কার, পদাতিক সৈন্যদল তাদের তাড়া করে এল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা দিয়ে যেন কি হয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টির মত গুলী বর্ষণ চল্‌ল কিছুক্ষণ। প্রবীর গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিল কিছু পেট্রোলের সন্ধানে। পেট্রোল না পেয়ে গাড়ী চল্‌বে না। কিন্তু অনেক ঘুরেও সে পেট্রোল না পেলে ফিরে এসে দেখে যেখানটায় সে নরেশ ও ওসমানকে রেখে গিয়েছিল সেখানটা রক্তের প্লাবনে ডুবে গেছে যেন। এখানে-সেখানে মৃতদেহের ছড়াছড়ি। প্রবীর গাড়ী থামিয়ে নরেশ ও ওসমানের খোঁজ করতে লাগল কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পেলে না। প্রবীর ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠ্‌ল—ভয় এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। তবে কি যা ঘটা উচিত নয়, তাই ঘটেছে! সেকথা যেন ভাবতেও কেমন লাগে।

বস্তির মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়ে এসে তারা এই দিকটায় উঠেছিল। কোথাও কিছু ঘট্‌লে

তাড়াতাড়ি এখান থেকে চারিদিকে যাওয়া অনেকটা সোজা কিন্তু কখন যে কি হয় তা কিছুই বলা যায় না। হয় তো ছুটে এসেছিল উন্মত্ত জনতা। মিলিটারী পিছনে পিছনে এসেছে তাদের গুলী করতে করতে। আর তারি ফলে এত মৃতদেহ চারিদিকে ছড়ানো। এখানে তো এতলোক ছিল না একটু আগেও। প্রবীর মৃতদেহগুলো পরীক্ষা ক'রে ক'রে দেখ্‌তে লাগল। মেসিনগানের গুলীর দাগ রয়েছে সব দেহগুলোতে।

কিন্তু ওসমান ও নরেশ গেল কোথায়? তারা কি এত বোকা হবে যে এই গুলীর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তাতো নাও হতে পারে?

একটি একটি করে মৃতদেহের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে প্রবীর এগিয়ে চল্‌ল। মৃতদেহগুলোর দিকে সে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন সে যা মনে করছে তা সত্যি নয় অথচ মনের ভয়কে সে মুছে ফেল্‌তেও পারছে না।

তখন অপরাহ্ণ পার হয়ে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় আকাশ ও পৃথিবী ম্লান হয়ে উঠেছে। ধূমাচ্ছন্ন মহানগরীর আবেষ্টনী যেন তার ওপর আরও এক পোঁছ ম্লানিমা মিশিয়ে দিয়েছে। আবার নেমে আস্‌বে অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার। আবার ভুতুড়ে রাত্রি হাহাকার করবে গত রাত্রির বীভৎসতার মত।

প্রবীর শঙ্কিত চিত্তে এগিয়ে চল্‌ল। এবার যেন সে আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রাস্তার মৃতদেহগুলোর দিকে একটু ভাল করেই যেন সে তাকাচ্ছে।

মনে মনে সে এইকথাই বল্‌তে চায়, যা তার মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে যেন তা কখনও সত্যি না হয়। কিন্তু মন শুনবে কেন? যত সময় যাচ্ছে ততই যেন তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে ওসমান ও নরেশ বেঁচে নেই, ওসমান ও নরেশ মরেছে। এখানকার গুলীবৃষ্টির মধ্যে তারা অসহায় হয়ে পড়ে হয় তো প্রাণ হারিয়েছে।

বাস্তবিক তাই। ঐ তো একটা ডাষ্টবিনের পিছনে ছুটো লাস। বর্ব্বর পৃথিবীর পাশবিকতার প্রতি যেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। ঐ তো ওসমান যেন তার দিকে তাকিয়ে। ঐ তো নরেশ রয়েছে ওসমানের দিকে তাকিয়ে। প্রবীর পাগলের মত শব ছুটোকে জড়িয়ে ধরল। চোখছুটো তার যেন অশ্রুবর্ষণ ক'রতেও ভুলে গেল।

মানুষের জীবনে এ এক বড় পরীক্ষার সময়। জীবনের চলার পথে সহসা মানুষ যদি তার সাথী হারিয়ে ফেলে তবে সে মানুষ তখন কি করে—তা রীতিমত একটা ভাববার কথা। বিজ্ঞজনেরা বল্‌বে, এ-করা উচিত ছিল, সে-করা উচিত ছিল, কিন্তু এ অবস্থায় কি মানুষ ভেবে কিছু ক'রতে পারে না তার পক্ষে তা পারা সম্ভব? সে যা করে তা তার অন্তরের প্রেরণাতেই করে।

হয় তো গুলীবর্ষণের মধ্যে পড়ে আত্মরক্ষার করবার জন্যে পালিয়ে আসছিল এদিকে—এমন সময় গুলী এসে লেগেছে। এমনি অবস্থায় প্রবীর কাঁদতে ভুলে গেল, ছুঃখ করতে ভুলে

গেল। জালালাবাদ, কালারপুলে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে এমনি ক'রে একদিন সে তার প্রিয় সাথীদের হারিয়েছিল, সেদিন তার চোখ থেকে অশ্রু ঠিকরে পড়ে নি—ঠিকরে পড়েছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। আজও সেই ঘৃণারই অভিব্যক্তি দেখা গেল তার মুখে চোখে। শুধু ঠোঁট দুটো যেন নড়ে উঠল বার কয়েক, কি যেন বল্‌তে চাইল। মনের ভাষা, মুখের ভাষা এক ক'রে যেন সে বলতে চাইল, দাঙ্গা হ'ল, সবকিছু হ'ল—বন্ধু মরলে তোমরা, যারা মানুষ বাঁচিয়ে ফিরছিলে! সাম্রাজ্যবাদ প্রথম সুযোগে তোমাদেরই হত্যা করেছে, হত্যা ক'রেছে সে কংগ্রেসের সত্যিকারের প্রতিনিধিকে, আর হত্যা ক'রেছে লীগের প্রকৃত প্রতিনিধিকে। কংগ্রেস লীগের ওপর খাড়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র। ওসমান, নরেশ এই দাবানলের মাঝখানে, আমার অকৃত্রিম বন্ধু, আজ আর আমার বলার কিছু নেই—বন্ধু তোমাদের আত্মা ভারতের ঘরে ঘরে মানুষকে বর্ব্বর ভ্রাতৃ-বিরোধের পথ থেকে ফিরে আসতে আলো ধরুক, আজ আমি এই কামনাই করি।

কিন্তু আর নয়। এই বার শহীদ দুজনের সমারোহে না হোক্ অন্ততঃ সসম্মানে শেষ কৃত্য সমাপন করা উচিত।

হ্যাঁ—তাই সে ক'রবে, প্রবীর ওসমান ও নরেশের মৃতদেহ দুটিকে একে একে সেই মোটরটায় তুল্‌ল। কিন্তু তার খেয়ালই ছিল না যে মোটরে পেট্রোল নেই! মৃতদেহ দুটি

গাড়ীতে তুলেও সে নিয়ে যেতে পারল না—নেমে আসতে হ'ল তাকে।

সন্ধ্যা নামে নামে প্রায়। আকাশের এদিক-সেদিকে দু-একটা নক্ষত্রও ফুটে উঠেছে। প্রবীর স্থির করল যদি পথে সে রেডক্রস বা অন্য কোন গাড়ীটাড়ী পায়, তো ডেকে আনবে। আর তাও যদি না পায় তো কিছুটা পেট্রোল! সে সেখান থেকে চলবার জন্য পা বাড়ালো।

আজ যেন প্রবীর আবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সেই পুরাতন আসামী। মনের সমস্ত দৃঢ়তা কেন্দ্রীভূত ক'রে যেন উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ল। দ্রুত পথ চল্‌তে চল্‌তে সে একবার অনুভব ক'রে নিলে সেই হাতবোমা আটটা আর পিস্তল দুটো। এগুলো তাদের কাছে ছিল—ইচ্ছে করলে তারা অনেক মানুষ মারতে পারত কিন্তু তা তারা মারে নি।

এগিয়ে চলল প্রবীর। চল্‌তে চল্‌তে এসে পড়ল সে কলকাতার শ্রেষ্ঠ জায়গায়, বাংলার শ্রেষ্ঠ জায়গায়—সেই কলেজ ষ্ট্রীটে। ক্লাইভ ষ্ট্রীট যেমন বাংলার অর্থনৈতিক-জীবনের হৃৎপিণ্ড তেমনি কলেজ ষ্ট্রীট বাংলার সংস্কৃতি-জীবনের হৃৎপিণ্ড।

সামনাসামনি যুদ্ধ হয়ে গেছে এখানে। সারা পথটা যেন নরককুণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে। সোডাওয়াটারের বোতল ভাঙা

প্রায় একইঞ্চি পুরু হয়ে আছে রাস্তার ওপর, ইট গুঁড়োর সঙ্গে মিশে সেগুলো যেন পথের ওপর নতুন ধরণের কোন কংক্রীটের সৃষ্টি করেছে। একটা গলির মুখেই দেখা গেল স্তূপীকৃত পোড়া বইয়ের ছাই। প্রবীর চমকে উঠল। মানুষের বর্ব্বরতারও বোধ হয় একটা সীমা থাকে। কিন্তু একি বই পর্য্যন্ত পোড়ানো হয়েছে! প্রবীর আরও এগিয়ে গেল, হ্যাঁ বইয়ের পর বই ছেঁড়া, পোড়া, গাদা করা, ছড়ানো।

ওদিকে মোটর কারে পড়ে আছে নরেশ আর ওসমানের মৃতদেহ। মনটা তাই কেমন হয়ে গেছে। তার ওপর আবার এই বই পোড়ানো। জাতির প্রাণধারাকে এমনি ক'রে হত্যা করার শিক্ষা মানুষকে কে দিল। কত বর্ব্বর হ'লে মানুষ তবে এমনি ক'রে বই পোড়াতে পারে। এই প্রসঙ্গে তার মনে পড়ল, বর্ব্বর নাৎসীনায়ক হিটলার ও নরপশু গোয়েবল্‌সের কথা। জার্ম্মান জাতির মত একটা সভ্যজাতিকে তারা কেমন ক'রে পথে বসিয়েছিল। শুধু তাদেরই শাসনের আমলে এমনি ক'রে বই পোড়ানো হয়েছে, এমনি ক'রে সংস্কৃতি ও সভ্যতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। মনে পড়ল গোয়েবল্‌সের সেই কথা when I hear the word culture I loosen my revolver. তাদেরই প্রেতাত্মা আজ এদেশের এই বই পোড়ানো দলের বুকে বাসা বেঁধেছে এসে বুঝি।

একটা দোকানের সামনে এসে প্রবীরের কান্না পেল। যে চোখের জল তার ঝরেনি ওসমানের জন্যে, নরেশের জন্যে, সেই

চোখের জল যেন ফেটে পড়ল এই দোকানটাকে দেখে। অন্ধকার নেমে এসেছে পথে, ভাল করে দেখা যায়না, তবু অন্ধকারে আবছাভাবে সে দেখল দোকানটার র‍্যাকগুলো আগুনে পুড়ে গেছে, বইগুলো সামনে ছাই হয়ে পড়ে আছে। স্তূপীকৃত ছাই, চলতে গেলে পা বেধে যায়।

দোকানটা একটা পুরোনো বইয়ের দোকান। ভারতের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার এই একটি মাত্র দোকান—বাংলার কত মনীষী, কত অধ্যাপক শিক্ষক, ছাত্র এখান থেকে প্রয়োজন মত বই সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। এই সেই বইয়ের দোকান—যেখান থেকে ব্লাডব্যাঙ্কের সংগৃহীত রক্তের মত রক্ত যোগানো হয়েছে মুমূর্ষু মানুষকে। প্রবীরও কতবার এখান থেকে কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য বই নিয়ে গেছে কিনে। দোকানটার প্রতি মমতায় মনটা তার হাহাকার ক'রে উঠল। সামনেকার সেই স্তূপীকৃত ছাই মুঠো মুঠো করে নিয়ে প্রবীর অনুভব করতে লাগল—এই সর্ব্বনাশের মাত্রা! তারপর যেমন ক'রে দেশপূজ্য নেতার, বা প্রিয়জনের শ্মশান-ভস্ম মুঠো-মুঠো তুলে নেয় মানুষ তেমনি ক'রে প্রবীর মুঠো মুঠো ছাই ভরে নিল পকেটে।

প্রবীর যেন ক্ষেপে গেল। গত দুদিন ধ'রে তার মনের ওপর, তার নার্ভাস সিষ্টেমের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়েছে। এ অবস্থায় মানুষ আর পিছন দিকে তাকাতে পারে না। সে

প্রায় ভুলেই গেল যে ওসমান আর নরেশের মৃতদেহ ফেলে রেখে এসেছে মোটর গাড়ীতে।

হ্যাঁ প্রবীর ভাবতে ভাবতে, এই দাবানলের বিস্তৃতি ও গভীরতা দেখতে দেখতে সে ক্ষেপে উঠেছে। কেমন করে মানুষ এমন বর্ব্বর হয়ে উঠল। মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, নেতৃত্ব, রাজনীতি—সবকিছু মিলে যেন একটা গোটা জাতিকে এই পথে টেনে এনেছে।

একটু পাশেই কটা ষ্ট্যাচু। প্রবীর এগিয়ে গেল ষ্ট্যাচুটার কাছে। হ্যাঁ এককালের মহাপুরুষই বটে। ভেংচি কেটে প্রবীরের বল্‌তে ইচ্ছে করল, তোমরা জন্মাওনি এদেশে, মিথ্যে তোমরা। তোমরা যদি মহাপুরুষ ছিলে তবে তোমাদের উত্তর-পুরুষেরা এমন ক'রে অমানুষ বর্ব্বর তৈরী হ'ল কি ক'রে? রেলিং ধরে উপড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করল ষ্ট্যাচুটা।

প্রবীর যেন সত্যিই ক্ষেপে উঠেছে। সত্যি সত্যি সে টান দিচ্ছে ষ্ট্যাচুটার রেলিং ধরে। চীৎকার ক'রে পারলে সে যেন বলে, মিথ্যে তুমি রাজা রামমোহন, মিথ্যে তুমি বঙ্কিম, ভূদেব, মিথ্যে তুমি মহসীন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, কাজী নজরুল! তোমরা আজকের এই বর্ব্বরদের পূর্ব্বপুরুষ বলে সমস্ত পরিচয় মুছে দাও—মুছে দাও।

সহসা পথ বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ঘড় ঘড় শব্দে ট্যাঙ্ক ছুটে আসছে। আর্মার্ড কার, পেট্রোললরী, প্রিজন

ভ্যান—সমস্ত কিছু যেন একসঙ্গে দূর থেকে গুলী বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আস্‌ছে !

ও ! সহসা একটা রাইফেলের গুলী এসে লাগল প্রবীরের তল পেটে। প্রবীর চীৎকার করে রেলিং ধরে বসে পড়ল, সেইখানে সেই পথের ওপর। পড়ে ছট্‌ফট করতে লাগল যন্ত্রণায়।

এবার শেষের পালা সুরু হ'ল যেন।

মাথার ওপর ধূ ধূ করা তারায় ভরা অনন্ত আকাশ। অন্ধকার রাত্রির কৃষ্ণ-কালো পটভূমির ওপর স্বর্ণখচিত নীলাম্বরীর মত। এক তিলও মেঘ নেই আকাশের, বুকে। যন্ত্রণায় প্রবীর ছট্‌ফট করছিল। গুলী লাগার যে কি যন্ত্রণা সে যে না গুলীতে আহত হয়েছে সে বুঝ্‌তে পারবে না। প্রবীরের সমস্ত চেতনা, সমস্ত চিন্তা, সবটুকু অনুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল তার ঐ ক্ষতস্থানের ওপর। পৃথিবীতে যেন কিছু সত্যি নেই, কিছু নেই বাস্তব—শুধু তার ঐ ক্ষতটুকু ছাড়া। চোখের সাম্‌নে তার নিজের শরীরের তিল তিল ক'রে সঞ্চয় করা রক্ত ধীরে ধীরে যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কোনরকমে সে পারছেনা সে রক্তকে চেপে ধরতে। এমনি ক'রে কি প্রবীরকে প্রাণ দিয়ে যেতে হবে?

হয় তো তাই করতে হবে, এমনি ভাবে, এমনিতরো অসহায় ভাবেই তাকে প্রাণ দিয়ে যেতে হবে। প্রবীর মাটিতে শুয়ে পড়ে তাকালো আকাশের দিকে। মনে পড়ল তার ওসমানের কথা, নরেশের কথা। মনে মনে ব'লে উঠ্‌ল, বন্ধু, সাথী আমিও তোমাদের পথে—

সারি সারি ট্যাঙ্ক চলেছে তেমনি ক'রে। আলোয় আলো হয়ে গেছে সারা মহানগর। ওদিকে উর্দ্ধমুক্ত উদার রহস্যময় রাতের আকাশ। উপরে আকাশ আর নীচে এই মাটি। এরই মধ্যে তার সারাদেশের কোমল কমনীয় স্পর্শ মাখা যেন। এই মৃত্তিকা, তার দেশের এই মাটি,—এই মাটির কোলে ধূলো কাদা মেখে সে মানুষ হয়েছে। আর ঐ আকাশ—শিশুকালে ঐ আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লুব্ধ দুটি বাহু মেলে কত ডাক ডেকেছে সে—হে আকাশ! তুমি কথা বলো, সাড়া দাও।

এমনিতরো রহস্যভরা রাতের আকাশে কৈশোরের কত স্বপ্ন-লেখা রেখায়িত ক'রে তুলেছে সে মনের তুলি দিয়ে। যৌবনে এসে আকাশের রহস্য আর রহস্য থাকেনি তার কাছে কিন্তু তবু তো ভাল লেগেছে। মনে পড়ে পৃথিবী যেমন করে মৌন-মুখর সম্ভাষণ জানায় আকাশের পানে: হে আকাশ বর্ষণ করো বর্ষণ করো মাটিতে, অঙ্কুরিত করো নব-জীবনের স্পন্দনকে—ঠিক তেমনি ক'রে পৃথিবীর সুরে সুর মিলিয়ে সেও বলেছে আকাশকে ঐ কথা। অনুভূতি প্রবণ মানুষ সে। আজ গুলীবিদ্ধ অবস্থায় যখন মরণের মুখে সে, তখন একটি একটি ক'রে তার এইসব কথা মনে পড়ছে।

তলপেটটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। এদিকেও শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে প্রবীরের। একে একে তার জীবনের সমস্ত

কাহিনী মনে পড়ছে। পড়ুক, বেশ লাগে সে সব স্মরণ করতে।

কিন্তু একি এই ভয়ঙ্কর দাবানল! গত দুদিনকার কথা চোখের সামনে ভেসে উঠল—সেই অবরুদ্ধ অবস্থায় মেসে আটক পড়ে থাকা, সেই ওসমানের যাওয়া, তারপর বেরিয়ে পড়া দুজনে, সেই হিন্দু পল্লীকে মুসলমান আক্রমণ থেকে বাঁচানো, সেই তাদের রেস্কিউ করা, সেই তাদের নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে প্রেসকারে ক'রে প্রেসে যাওয়া—একে একে সব ছায়া-ছবির মত তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। সেই কালু গুণ্ডা, সেই বাড়ীটার সেই দরজা বন্ধ করা ছোরা হাতে ছেলেটা তারাও একে একে মনের চোখে ধরা দিল। তারপর আজ সারাদিনের কথা। সেই বস্তিতে জানোয়ারের মত মানুষগুলো, সেই বসে বসে খবরের কাগজ পড়া আর হিন্দু ও মুসলমানের দোকানে শ্লিপ আঁটার ভুল বের করা, তারপর নরেশ, আবদুল্লা বুড়ো আর তার সেই পাথরে কোঁদা চেহারার মেয়েটি—সেই পাঞ্জাবী আর ওড়না পরিহিতা : আবার সেই বস্তি জ্বালানোর কাছে পথের মোটর গাড়ী নিয়ে যাওয়া, সেই মেয়েগুলোকে উদ্ধার ক'রে আনা। তারপর গেল নরেশ, গেল ওসমান—এখন সেও যেতে বসেছে।

হ্যাঁ যেতে তাকে হবেই। তলপেটে গুলী লাগলে কেউ বাঁচেনা, বিশেষ ক'রে চিকিৎসা না হ'লে। মরতে তাকে

হবেই। কিন্তু, তবু সেই মৃত্যু-পথযাত্রার পাশে পাশে কি যেন এক আশার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে দেখে সে।

সত্যিই কি আশার আলো!

পথে একটা লোকও নেই যে আহত প্রবীরকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু আর নয় প্রবীরের আর বেশিক্ষণ নয়।

সহসা প্রবীর যেন অনুভব করলে তার কাছে সেই হাতবোমা আর পিস্তল ছুটো রয়েছে। শেষবারের মত তার মনটা যেন নড়ে উঠ্‌ল কিন্তু শত্রু কে তার, কোন মানুষতো নয়, শত্রু তার মানুষের বর্ব্বর-নীতি। হত্যা যদি করতে হয় তবে সেই বর্ব্বর নীতিকে, অবসান যদি ঘটাতে হয় তবে তারই।

নরেশের মত কংগ্রেস কর্ম্মী দেখেছে প্রবীর, ওসমানের মত লীগ-কর্ম্মী দেখেছে। হ্যাঁ এদের সম্মিলনে একদিন এই বর্ব্বর-নীতির অবসান হবে, ভারতবর্ষে নেমে [illegible]সবে শান্তির শুভক্ষণ।

কিন্তু……

প্রবীর যেন আর পারে না। শরীরের রক্ত তার দেশের মাটিকে সিক্ত করে দিয়েছে, যে মাটি-মা তার জীবনকে এনে দিয়েছিল পৃথিবীর আলোমাখা পথে সেই মাটি-মা আবার তাকে ফিরিয়ে নিচ্ছে।

আবার সেই আশায় দীপ্তি!

একটা কথা প্রবীরের শেষবারের মত যেন সমস্ত চেতনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে ফেল্‌ল। এতবড় দাঙ্গা, এত বড় ঝড়, এই কল্পনাতীত ভয়ঙ্কর দাবানলের মাঝখান থেকে একটা সচেতন শক্তি বেশ যেন ভালভাবেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। হাঁ দূরেই সরিয়ে রেখেছে। তারা দূরে না থাক্‌লে কলকাতা ও শহরতলীর বিরাট শিল্পাঞ্চল ঝোড়ো-আগুনের শিখায় ভস্মীভূত হয়ে যেত।

প্রবীর তাদের অভিনন্দন জানাবার চেষ্টা করে। এই একটি মাত্র নেতৃত্ব সমস্ত কিছু ঝড়-ঝাপটার আড়ালে তিলে তিলে শক্তি সঞ্চয় করছে। প্রবীর মনে মনে বলে উঠল বন্ধু তোমরাই ভরসা। ভারতের নব-জাগ্রত শ্রমিক শ্রেণী তোমরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তোমরা শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখেছো, কাজেই তোমাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তোমরা এই ঝোড়ো আগুন থেকে দূরে সরে থেকেছো—এমনি ক'রে তোমাদের নেতৃত্ব দিয়ে তোমরা সারা জাতিটাকে এগিয়ে নিয়ে যেও। উপরকার নেতৃত্ব দেউলিয়া হয়ে গেছে, জাতিকে চালাতে তারা অক্ষম। তাদের 'কুইট ইণ্ডিয়া' 'স্টে ইন ইণ্ডিয়া' শ্লোগানে পরিণত হয়েছে আর লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। এদের এই মধ্যযুগীয় নেতৃত্ব থেকে স্বচ্ছ, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে

তোমরা এই মহান জাতিকে বাঁচিও, একে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও—

তারপর যেন সে শেষবারের মত শক্তি সঞ্চয় ক'রে কি একটা করাব চেষ্টা করল। অভিশাপ দেবে সে এই বর্ব্বরতাকে, আর এর মূলে যারা আছে তাদের। হ্যাঁ হয়েছে—আটটা হাতবোমা আছে তার কাছে। অভিশাপ দেবে সে অন্তরের সমস্ত ঘৃণা দিয়ে।

মাথাটা একটু তুলে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মেলে কোন দিকে যেন সে তাকালো। তারপর পথের একদিকে সে ছুঁড়ল একটা হাতবোমা ঃ ক্যাবিনেট মিশনের ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসি নিপাত যাক্……

আরেকটা ঃ নিপাত যাক্ ওয়াভেল-বাবোজেব ষড়যন্ত্র !

আরো একটা ঃ নিপাত যাক্ প্রতিক্রিয়াশীল-লীগ আর কংগ্রেস নেতৃত্ব।

তারপর উপর্য্যপরি—

নিপাত যাক্, প্রবঞ্চক সংবাদপত্রগুলোর বিষ ছড়ানোর নীতি।

নিপাত যাক্, ধনতন্ত্র।

নিপাত যাক্, কারখানার মালিকেরা যারা, ভেদ চেয়েছে মজুরের মধ্যে।

নিপাত যাক্ চোরাকারবারী আর বস্তির মালিকেরা—যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে ইন্ধন জুগিয়েছে এই দাঙ্গায়।

নিপাত যাও এই সমবেত বর্ব্বরতা একসঙ্গে, বলে শেষ বোমাটা ছুঁড়ে দিল প্রবীর।

রাতের অন্ধকারের বুকে সেকথা শুধু প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। প্রবীর সম্ভবতঃ তার শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করল।

সমাপ্ত